ছায়ালগ্ন

কৃশানু বন্দ্যোপাধ্যায়

অন্নপূর্ণা প্রকাশনী
৩৬, কলেজ রো
কলিকাতা—৭০০০০৭

প্রকাশক :—
শ্রীঅপরাজিত সাহা
৫১, শ্রীগোপাল মল্লিক লেন
কলিকাতা—১২

প্রথম প্রকাশ — মহালয়া, ১৩৩৯

পরিবেশক :—
বিজয় বুক ষ্টল
বঙ্কিম চ্যাটার্জী
কলিকাতা—৯

মুদ্রণে :
মহামায়া প্রিন্টিং ওয়ার্কস
৬৬, মানিকতলা ষ্ট্রীট
কলিকাতা—৬

সোনিয়া

স্থচরিতা—

সূচী

ছায়ালগ্ন

না—না—না—তুমি আমায় ছেড়ে যেও না—। কান্নায় ভেঙ্গে পড়েছিলো ইলোরা। বোলানের সঙ্গে শেষদিনের শেষ মুহূর্ত্ত। ওরা বিচ্ছিন্ন হচ্ছিল পরস্পরের থেকে।

না—না—লাক্ষ্মিটি,—না,—ছাড়ো,—ছেড়ে দাও না—। প্রথম দিন ইলোরার। উচ্ছাস্ আর উত্তাপ ছিল বোলানের।

ব্যবধান—অন্তবর্ত্তী সময়—দীর্ঘ দু'বছর। একই রক্ত একই ধমনী—চন্‌মন্‌ করেছে বারবার, বিপর্যস্ত করেছে বহুবার, বিধ্বস্ত করেছে অনেকবার। মায়া দিয়ে ঘিরেছে—মমতা দিয়ে ঢেকে নিয়েছে ইলোরা বোলানকে। যেদিন ইলোরা প্রথম বুঝতে পারলো বোলান অপরিহার্য্য—লজ্জা পেলো মনে মনে, লুকাবার প্রয়াশ জাগলো, যেমন জেগেছিল ঈভের। দিনান্তে ঈশ্বর তত্ত্বাবধানে এলে লুকিয়েছিলো ওরা ছায়ান্ধকার আড়ালে—শুনতে পেয়েছিলো ঈশ্বরের আহ্বান—আদম—আদম—তুমি কোথায়? বুঝতে পেরেছিলো ঈভ লজ্জা কত অসহায় করে—ভয় কত বিপর্যস্ত করে।

ঢং—ঢং—। রাত দু'টো—। তন্দ্রা টুটে যায়—ঘুম ভেঙ্গে যায় ইলোরার। এটা যে ওদের বিদায় লগ্ন। মহাঘুর্ণী অতলে নেবার আদিলগ্ন। নিদ্রাহীন হয়ে জীবন যন্ত্রণায় এপাশ ওপাশ করে, প্রহর গোণে, শেষ যামের প্রথম পরশ পেলে চোখ বুজে আসে—ঘুমোয়—ওটা যে ওদের মিলন লগ্ন—ঘুর্ণির জন্মলগ্ন—।

কতোদিন সে কুনালের আদর উপেক্ষা করেছে—কতোদিন সে কুনালকে সাড়া দেয়নি—আজকাল তো কুনালকে সে রুখে রাখে। আদর—একতরফা অচল বুঝতে পারে কুনাল। সবটাই যে দেওয়া

নেওয়ার ব্যাপার জেনেও বুঝতে চায় না ইলোরা। ঘর তাই ঘরনী ভেবে নিয়ে ওপাশ ফিরে শোয়। কুনাল কি আর জানে কীটে কাটা পদ্ম—ইলোরা!

অধ্যাপক কুনাল চৌধুরী—কি নেই তার! ব্যক্তিত্ব রয়েছে, যশ রয়েছে। অধ্যাপনা ছাড়া লেখা থেকেও রোজগার করে দু'মুঠো ভর্ত্তি। চারপুরুষের বনেদ্—গাড়ী-বাড়ী কোলকাতায়।

পাত্রী থেকে কনে—পরিণীতা ইলোরা সেন—ইলোরা চৌধুরী। দেখে—শুনে—বুঝেইতো মত দিয়েছিলো ইলোরা তার বাবাকে—মাকে। তবে—?

বনেদী বাড়ীর ছেলে বিয়ে,—অনুষ্ঠানের ধুমধাম তাক্ লাগানো। খুব ভালো লেগেছিলো ইলোরার—গর্বিতা হয়েছিল ইলোরা। স্বজন বন্ধুরা সবাই জানতে পেরেছিল—বুঝতে পেরেছিলো' তা হলে —?

মধুচন্দ্রিমার দিনগুলি—সম্রাট আর সম্রাজ্ঞী—কুনাল আর ইলোরা। তখন—?

বিস্মরনের আস্তরনে তাপদগ্ধ জমাট বাধিয়ে দিয়ে গেছে একটা উল্কাচ্ছটা—বোলান—।

মানবিক আবেদন উপেক্ষিত—মহানুভবতা বিদ্রুপ কষায়িত, তবে কি দুর্বলতা—! যেদিন ভালো ভাবে বুঝতে পারলো কুনাল—ব্যক্তিত্বে শ্লাঘা বোধ করেছিলো সে। আর সেদিন থেকেই শুরু হলো ঘুর্ণির তাণ্ডব।

মরিয়া হয়ে উঠেছিল ইলোরা যেদিন সে প্রথম বুঝতে পারলো সে উপেক্ষিতা—। কুনাল এক ঘরে বাস করে কিন্তু এক ঘরে ঘর করে না। ঘুম আসে না প্রথম যামে,—ঘুম থাকে না শেষ যামেও। সড়ে গেছে ছায়ালগ্ন—বোলান তুমি কোথায়,—সাড়া দিচ্ছনা কেন বোলান—? কাছে এসো বোলান—।

আসবো কি—! তুমি যে ঘুমোও না,—যেন ফিস্ ফিস্ করে

বলছে বোলান। কান পেতে শুনতে চেষ্টা করে, বুঝতে চেষ্টা করে ইলোরা।

তুমি কি আমায় ভুলে যেতে চাও বোলান– ?

না—।.

—তাহলে আসছো না কেন ?

বললাম তো— ?

ঘুম–ঘুম—আমার ঘুম কেড়ে নিয়েছে কুনাল—বুঝতে পারে ইলোরা। আচ্ছাদন আছে—ছায়া নেই ; জ্বালা আছে—জুড়ানোর পথ নেই। ভোর হয়—রোদ ছড়ায়—।

ঘুম ভাঙার পর কম সময় হাতে পায় কুনাল। বাথরুম থেকে বেড়িয়ে সোজা খাবার টেবিল—সকালের খাবার। সকালের খাবার এসব তো জুলেখাই দিয়ে আসছে প্রথম থেকে। জুলেখার মা কাজ করতে করতে এ বাড়িতেই মারা গেছে বুড়ো কর্ত্তাদের সময়। মেয়ে জুলেখা আস্তে আস্তে মায়ের স্থান নিয়ে নিয়েছে—। জুলেখার দিদিমা এ বাড়ীতে প্রথম এসেছিল কুনালের ঠাকুরদার আমলে লক্ষ্ণৌ থেকে। কোলকাতায় তখন বাবুকালচার—। সেই থেকে হ্রস্ব-ই আর দীর্ঘ-ঈ-র ব্যবধান রেখে ওরা এ বাড়ীরই লোক হয়ে গেছে। স্নেহ আদরের অভাব এদের আজও ঘটেনি এ বাড়ীতে—।

বড়দা তুমি আজকাল এমন কি ব্যস্ত হয়ে পড়েছো, দুটো খেয়ে দেয়ে বেড়বার সময়ও পাও না—আর ফেরো তো সেই কোন রাতে—। নীচে বিষেণ সিং আর উপরে বৌদি—এছাড়া তো কেউ এ বাড়ীতে বুঝতেও পারে না জানতেও পারে না। তাও রাতে ফিরে কোন দিন খাও—কোন দিন অমনি ঢাকা পড়ে থাকে তোমার খাবার।

—জুলেখা, এই সকালে তোকে অমন কে বোক্‌তে বলেছে,—যা —যা তো। কুনাল গম্ভীর হয়ে বলায় চলে গিয়েছিলো জুলেখা। বেরবার মুখে ইলোরা সামনে এসে মুখোমুখি দাঁড়ালো কুনালের—চোখে চোখ রেখে বললো তোমার সঙ্গে আমার কিছু কথা আছে।

—বলবে। ঘড়িটার দিকে তাকিয়ে চেয়ে নিলো কুনাল তারপর বললো এখন সময় খুবই কম দুঃখিত। পরে কখনও বলো—। অপেক্ষা করেনি কুনাল,—একবার ভালো করে তাকালোও না চেনা কি অচেনা। সম্পর্কের প্রশ্নতো দূরের কথা,—বেড়িয়ে পড়েছিল কুনাল।

জ্বালা—জ্বলে। জ্বালানি থাকলে জ্বলে—আপেক্ষিক উপকরণ পেলে আরো ভালো জ্বলে। "নিষ্ঠুর—অসভ্য" চাপা কিন্তু স্পষ্ট দুটি কথা বেড়িয়ে এসেছিলো ইলোরার মুখ থেকে। জ্বালা,—এ জ্বালার রং নীল নয় এ জ্বালার রং যে রক্তিম বুঝছে ইলোরা।

পুঞ্জীভূত অভিযোগেরই অভিব্যক্তি এই নিষ্ঠুর—অসভ্য, কিন্তু —কেন? অভিযোগ কেন—? আর অভিযোগ যদি সুস্পষ্ট হবে তা হলে সামনা সামনি দাঁড়াতে পারলো না কেন? তবে কি অভিমান—? না, ঠিক তাও নয়—। অভিমান তো সেখানেই খাটে যেখানে সদতা ভয়ানক স্বচ্ছ। আত্মজিজ্ঞাসার শিকার হয়ে পড়েছে ইলোরা—কৈফিয়ত চাইতে জবাবদিহি করতে হয় মর্মান্তিক ভাবে। ক্লান্ত হয়ে পরে ইলোরা—। বুঝতে পারে ইলোরা —বাড়তি পাওনা কেমন বিভ্রান্ত করে, কত অসহায় করে ছেড়ে দেয়—।

মানুষ যে দিন প্রথম সভ্য হতে শিখেছিলো—অধিকরণ নিষিদ্ধ হলো অধিগ্রহণকে মূলধন করলো; কিন্তু সমীকরণের স্থায়ী সংজ্ঞা আজও নিরোপিত করতে পারে নি মানুষ,—তাই তো যুগে যুগে কত না বিভ্রান্তি,—দেবতারাও সেখানে অশান্ত অশুচি বলে চিহ্নিত, আর মুনি ঋষি তারাতো তাদের মূলধন বাজি রেখেছে—জুয়া খেলেছে।

ধিকৃত আর তিরস্কৃত হয়েছে তবুও স্মরণীয়া হয়ে আছে একাধিক নারী—। অভিশপ্তা হয়েছে—এমন কি নিষ্ঠুর ভাবে নিহত হয়েছে তবুও তারা স্মরণীয়া। সমীকরণের স্থায়ী সূত্র আজও বুঝি কেউ দিতে পারে নি। আত্মার আত্মন,—অত্মতা, বলবে তা যত

ক্ষণ স্থায়ীই হোক না কেন—। সহজ সমীকরণ,—সত্যই সূত্র—অসত্যের সূত্র হয় না।

স্বস্তি ফিরে পায় ইলোরা শান্ত হয়ে আসে, ভাবে—বোলান—তার বোলান—তার আত্মতার লগ্ন—আবেশ নিঃসৃত লগ্ন—। সমীকরণেয় সূত্র পায়—বিভোর হয় ইলোরা।

গুণীজন সম্বর্ধনা সভার আমন্ত্রণ সেরে ফিরতে আজ বেশ রাত হলো কুনালের। তার একটি লেখা বহু বিতর্কিত হয়েছে, তাই তো তার আজকের এই আমন্ত্রণ। প্রতিষ্ঠার সোপানের মোড় ফেরাব ধাপ,—দম নেবার অবকাশ—। আজকের দিন—কুনালের,—ডায়েরীতে চিহ্নিত করে রাখার দিন। আর—মুহূর্তগুলো—স্মৃতিভাণ্ডে সযত্নে জমা করে রাখার মত সঞ্চয়,—বার্ধ্যকে স্মৃতিচারণে সুখানুভূতির গুপ্তধন।

আভি তো দেড় বাজনে চলা বাবুসাহেব। বড়বাবু এক দফে শোচা থা—। দরজা খুলে বিষেণ সিং জানালো কুনালকে।

কখন রে বিষেণ ?

এই বারো বাজে হোগা—।

ঠিক আছে—এই নে, কাল সকালে মিঠাই কিনে খাস। একটা পাঁচ টাকার নোট বের করে দিয়ে উপরে উঠে গেল কুনাল।

ঠিক বুঝে উঠতে পারলো না বিষেণ, বাবুসাহেব আজ এতো খুশ মেজাজে কেন ?

বাবার ঘরে এখনও আলো জ্বলছে দেখতে পেলো কুনাল, আস্তে আওয়াজ করে ঢুকে পড়ে বললো—তুমি এখনও ঘুমোওনি বাবা—! আমার ফিরতে আজ একটু দেরী হয়ে গেছে তাই বলে তুমি এত উদ্‌বিগ্ন হয়ে পড়েছো কেন— ?

এত রাত অবধি বাইরে থাকতে নেই—।

শোনো বাবা—আজ আমার খুশীর দিন, আমার একটা লেখা অনুমোদন পেয়েছে তাই একটা সভায় আমার ডাক পড়েছিলো। বাবা এক দৃষ্টিতে কুনালের দিকে তাকিয়ে আছে চোখ দুটো

তার চকচক্ করে উঠছে, বুঝতে পারে কুনাল—আশীর্বাদ ঝরছে।

তুমি এবার ঘুমোও বাবা—। বেরিয়ে এলো কুনাল।

এ ঘরে যে আর একটা মানুষও বাস করে সে কথা তো অনেক আগেই ভুলে গেছ—! বাকী রাত টুকুর জন্য বাড়ী না ফিরলে এমন কি আর হতো—?

'অশ্লীল'—ছোট করে জবাব দিয়ে পাশ কাটিয়ে গেল কুনাল।

অপ্রস্তুত হয়ে গেল ইলোরা—এমন ধারার জবাব আশা করতে পারে নি, ইলোরা ক্ষোভে লাল হয়ে উঠলো, কিছু বলতে পারলো না—। একটু সামলে নিয়ে আবার বললো—ক'দিন থেকেই বলবো বলবো করছিলাম কিন্তু তোমার মত ব্যস্ত লোকের সময় নেওয়া অসুবিধা অনেক। শোনো—আমি ক'দিনের জন্য ও বাড়ীতে যাবো। মায়ের নাকি শরীরটা ক'দিন থেকেই ভালো যাচ্ছে না।—কি বলো?

এ বাড়ীর অনুশাসন এখনও আমার হাতে আসে নি। বাবা এখনও বেঁচে আছেন। এ বাড়ীর নিয়ম, দস্তুর মেনে চলতে হয়।

রাত দুটোয় বাড়ী ফেরা বুঝি এ বাড়ীর ছেলেদের দস্তুর— ?

সাট্-আপ—। অধিকার জন্মায় আর দায় বর্তায়—। আশা করি কখনও ভুল করবে না—।

চীৎকার করছো কেন— ? বেশামাল হয়ে আছো বুঝি—?

হোয়াট এ স্টুপিড—। কাঁপছে উত্তেজনায়—কাঁপছে কুনাল। আমাকে কিছুক্ষণ একা থাকতে দাও—প্লীজ। দু'পা এগিয়ে গিয়ে আলোটা নিভিয়ে দিয়ে জিরো বাল্বটা জ্বেলে দিয়ে ফিরে এলো একদম্ ইলোরার মুখোমুখি—বললো যাও শুয়ে পরো গে—ঘুমোও গে। ঘুমাতে দাও। যেতে হয় কাল বাবাকে বলে চলে যেও। আর একটুও দাঁড়ালো না কুনাল—সোজা চলে এসেছিলো আপন বিছানায়। ইলোরাকেও আর কিছু বলার সুযোগ দেয় নি কুনাল।

বাকী রাত ঘুমোতে পারে নি ইলোরা। জ্বলেছে—দহন—। উপেক্ষিতা—তবে কি অবাঞ্ছিতাও! কুণাল যে ভাবে বললো তাতে তো তার এখানে থাকা আর না থাকা দুয়েই যেন এক আর সমান। গুমড়াতে থাকে ইলোরা—চীৎকার করে বলতে ইচ্ছা হয় —"একটা অমানুষ",—অসহায় অবস্থার সুযোগ নেয় নীচ আর হীনেরা। একটা অশ্রদ্ধা আর চাপা ঘৃণা উত্তেজিত করেছে—নাজেহাল করে ছেড়ে দিয়েছে ইলোরাকে। ইলোরা শ্রান্ত—। নিশাবসানের অপেক্ষা—।

কে—? ইলা-মা 'তুমি—! এতো সকালে—এসো বসো। কি ব্যাপার বলোতো মা!

বাবা আমি এসেছিলাম,—আমি আজ ও বাড়ী যাবো। মায়ের শরীরটা বেশ কিছু দিন থেকেই খারাপ যাচ্ছে—মনটা ভালো নেই, আপনি যদি বলেন ক'টা দিন থেকে আসবো।

ও—এই কথা! বেশ তো যাবে—। খুব একটা বেশী দিন থেকো না। তা—মা, তোমার চেহারা এমন হয়েছে কেন, ঘুমোও নি বুঝি—? মায়ের শরীর খারাপ করেছে আগেও তো চলে যেতে পারতে, আমায় আগে এসে বলোনি কেন? কুনাল তো কাল রাতেও আমার এখানে এসেছিলো—সেওতো কিছু বলেনি। তুমি কি তাকে বলনি—?

বলেছি—।

হয়তো সে আমায় বলতে ভুলে গেছে—নইলে সে নিশ্চয়ই বলতো! গিয়ে চিঠি দিয়ে জানাবে তোমার মায়ের স্বাস্থ্য কখন কেমন থাকে—।

আচ্ছা, বাবা—।

কুণাল তো গাড়ীটা নিয়ে তোমাকে পৌঁছে দিয়েও আসতে পারে—।

ওর নাকি কি জরুরী কাজ আছে। তা আমি একাই চলে যেতে পারবো বাবা—।

এসো মা—।

রাতে ফিরে কুনাল বুঝতে পারলো ইলোরা তার মায়ের বাড়ী চলে গেছে। কেমন যেন ঘরটী তার ফাঁকা-ফাঁকা বোধ হলো। নাইবা থাকলো সম্পর্ক মধুর কিন্তু তাই বলে ইলোরার অবর্ত্তমান যেন কিছু একটা শূন্যতারই জানান দিয়ে যাচ্ছে।

জুলেখা সকালে চা দিতে এলেই জিজ্ঞেস করেছিলো কুণাল—হ্যাঁরে জুলি তোর বৌদি কিছু বলে গেছে রে?

কি বলবে দাদা?

কেন—কবে আসবে বা আর কিছু।

না দাদা। বৌদির মুখখানা কেমন থমথমে দেখেছিলাম। বৌদির মায়ের নাকি শরীর ভাল নেই।

হুঁ—। আর কিছু বললো না কুণাল।

বেশ ক'দিন হয়ে গেলো ইলোরা চলে গিয়েছে—কুণালের বাবাকে চিঠি পাঠিয়েছে ইলোরা। 'মায়ের শরীর একটু ভালর দিকে—ক'দিন পরে আমি যাবো বাবা।' অনুরোধ করেই লিখেছে ইলোরা—তিনি যেন রাজি থাকেন।

ইদানিং সন্ধ্যার সময়টা কাটানোর ধরণ পাল্টে নিয়েছে কুণাল, বাড়ী ফেরে একটু রাত করেই। কুণালের বাবা এখন আর কিছু মনে করে না। ভাবে ছেলে তার পর্যায় মতো বন্ধুদের সঙ্গে সময় কাটায় আর তার তা হয়তো বা দরকার।

সুনিয়ন্ত্রিত মৃদু আলোয় ড্যান্সিং ফ্লোর—ভায়োলিনে মেলোডি বাজছে,—কটি বেষ্টন করে নিকটতম আর নিবিড়তম হতে চাইছে হাল্কা সুরে গা ভাসিয়ে দিয়ে সীমিত জায়গায় পা রেখে পা ফেলে —জ্যামিতিক। মাঝে মাঝে টুং টাং আওয়াজ এ টেবিল আর ও টেবিল থেকে।

বেশ কিছুক্ষণ থেকে কুণাল একা একটা টেবিলে বসে তার দ্বিতীয় বারের পানীয় শেষ করে নিয়েছে—তৃতীয় বারের অপেক্ষায়। সিগারেটের ধোয়া ছাড়ছে আর এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে গ্লাস্‌টার

দিকে—যেন বহ্নিমান শিখা থেকে সপ্ত রং আলাদা করতে চাইছে—কুনাল—পারছে না—গুলিয়ে যাচ্ছে, মিলিয়ে ফেলছে—।

সুর লয়ে আসছে—আলোর নিয়ন্ত্রণ তুলে নিচ্ছে আস্তে ধীরে—আরও ধীরে—সুরের সঙ্গে সমন্বয় রেখে। চোখ পড়লো—ড্যান্সিং ফ্লোরে—দৃষ্টিটা কেড়ে নিলো—একজোড়া ডায়মণ্ডের ঠিকরে পরা আলো—। —হ্যাঁ—তাই তো—ইলোরা—! তারই দেওয়া ইয়ারিং—প্রথম উপহার—, ফুলশয্যার রাতে দেওয়া ইলোরাকে—। সঙ্গে কে এই ছেলেটি—! সুঠাম আর প্রাণবন্ত—উচ্ছলতায় আরও একটু উজ্জ্বল মনে হলো কুনালের। দাঁড়িয়ে পড়েছে—কুনাল, দাঁড়াবার ভঙ্গি দেখেই ঘিরে নিয়েছিলো ওয়েটাররা—। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বাকী পানীয় একচুমুকে শেষ করে নিলো—কুনাল। গ্লাসটা টেবিলে রাখার আওয়াজ সচকিত করেছিল অনেককে—। ইলোরা দেখতে পেলো, —কে কুনাল না—! —হ্যাঁ কুনাল। মুখটা লুকিয়ে নিলো—বোলানের ঘাড়ের পিছনে—জড়িয়ে ধরলো বোলানকে—, ফিস্ ফিস্ করে বলছে—বোলান দ্যাখো—'কুনাল'—! আমাকে দেখে ফেলেছে নিশ্চয়ই। দ্যাখো বাইরে নিয়ে যাচ্ছে ওকে। চলো আমরা—চলে যাই এখান থেকে—।

সামনে টেনে ধরে বোলান তাকিয়ে দেখলো ইলোরার মুখখানা ফ্যাকাশে হয়ে গেছে—একটু হাসলো বোলান—'শঙ্কিত হয়ে পড়েছো—?' আর একটু জোরে হাসলো বোলান—।

—তুমি বুঝছো না বোলান—!

কি বুঝছি না—ই-রা—বলো, তুমি ভয় পেয়ে গেছো—তাই না!

—ভয় কেন—?

তবে—?

—তুমি বুঝবে না—।

কেন বুঝবো না—।

—তোমরা পুরুষ—আর তোমার প্রথম অধ্যায়—আমরা মেয়ে আর আমার দ্বিতীয় অধ্যায়—। স্নায়ু দুর্ব্বল হয়ে পড়েছে,—বুঝতে

পারে ইলোরা—একটা আনুষ্ঠানিক মন্ত্রগুপ্তির প্রভাব কত যে প্রচণ্ড হতে পারে—! বুঝতে পারে ইলোরা গোপনতা ঈপ্সার কত সহায়ক—!

মনে হয় তুমি ভয়ানক ক্লান্ত হয়ে পড়েছো—ই-রা। চলো বসবে।

আর নাচেনি-ইলোরা—বাড়ী ফিরেছিলো একটু বাদেই। পথে খুব কম কথা বলেছে ইলোরা—শুধু হ্যাঁ—না দিয়ে সীমিত রেখেছে বোলানের অনুসন্ধিৎসু জিজ্ঞাসা।

—আমাকে ভুল বুঝতে চেষ্টা কোরো না বেলান—! শেষ কথা ইলোরার—বোলানের শুভরাত্রি জানানোর বিনিময়ে।

বাড়ী ফিরে সাড়া রাত ঘুমোতে পারেনি ইলোরা—কতদিন তপ্ত হয়েছে সে নিজে—উত্তপ্ত করেছে বোলানকে—। —আমাকে ভুল বুঝতে চেষ্টা করো না বোলান—।

—আমাদের গোপন শপথ—আমি কোনদিন ভুলবো না—ই-রা। তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পারো। কখন ভোর হয়েছিল—রোদ ছড়িয়েছিল জানতে পারে নি—বোলান—।

ঘুমোয় নি কুনাল সারারাত—ভেবেছে আর ভাবছে প্রেম বিবাহের মৌল সর্ত্ত নাও হতে পারে,—আর প্রেমহীন বিবাহ যে আদর্শ—নয় বুঝতে পারে কুনাল। ইলোরা কুনালের জায়া বুলানের গোপন প্রিয়া, ইলোরার এই দ্বৈত সত্তা কত যে অবাঞ্ছিত আর এ যে কি দহন—! প্রেমের পরাভব সে তো জীবনেরও পরাভব—ঘুমোয় নি কুনাল—ঘুমোতে পারে নি কুনাল সারারাত—।

—:—

আঃ——আ—। —লাগে না—বুঝি—! একটা সুখানুভূতির উচ্ছ্বাস আরও বেশী চঞ্চল করে দিয়েছিলো তুষারকে—। তাই বলে ওয়াইল্ড হয়ে পড়ে নি তুষার।

থাকো,—এমনি করেই থাকো—ভয়ানক ভাবে অনুরোধ করেছিলো মেমসাহেব। আপ্লুত—পরিপ্লুত—শিথিল হয়ে পড়েছে মেমসাহেব—তুষার নয়। এ ট্রিক্‌লিং স্ট্রীম—। তুষার বড্ড কন্‌সিডারেট, সে জানে নেওয়ার চাইতে দেওয়ায় বেশী সঞ্চয় আনে। দেওয়া নেওয়ার কারবারে তুষার ঝানু কারবারী—।

থ্রিল,—রিয়েলি—টেম্‌টিং ক্রল—! উন্মাদনা এনে দিয়েছে—দিশেহারা করে দিয়েছে তুষার। মেমসাহেব ভেনচারাস। রাতের অন্ধকারে দীঘির পাড়ে পোড়ো কুঁড়ে ঘরের মেঝেতে ওভার কোটটা ছড়িয়ে দিয়েছিলো তুষার—।

*   *   *   *

ইফ দেয়ার ইজ হেভেন—তুষার! জ্যোৎস্না স্নাত মেমসাহেব—ঘাসের উপর পড়ে আছে তুষার নিজেকে তিরিশ ডিগ্রিতে রেখে কোণ করেছে—মেমসাহেবের মুখটাকে টেনে এনে নিজের মুখের একদম কাছে,—যেন ক্যামেরা স্নাপ নিতে যাচ্ছে—রেডি—ক্লীক্—। তুষার একদৃষ্টিতে দেখছিলো মেরুন রঙে রাঙানো ঠোঁটে রূপালী আলোর ঝিলিক—টল্‌টল্ করছে—।

—কি দেখছো অমন করে তুষার—! জহর নয়—শারাব। পান করো যতো খুশী পারো—। দি এনার্জি-লষ্ট-দি এনার্জি গেইনড—। বুঝলো তুষার আবার রিক্ত হতে চাইছে মেমসাব। জ্যোৎস্না রাত নিঝুম

হলে ওরা চলে আসতো ফার্ম হাউসে। আদিম হয়ে যেতো ওরা—একেবারে আদিম—। যেন আদম আর ঈভ—! চঞ্চল হয়ে ঘুরে বেড়াতো—উচ্ছ্বল হয়ে হাসি ভাসিয়ে দিতো বাতাসে—। আকাশ—জমিন—আর ওরা—। —ওরা আদিম—।

* * *

—যাঃ,—কি হলো তুষার—। তুমি বড্ড নার্ভাস হয়ে পড়ো আমার এখানে এলে—। তুমি তো জানো অল এ্যাপলায়েড করেকট্‌লি। হি হ্যাজ বিন ড্রাগড হেভিলি—। কখনও ও জেগে উঠবে না—উঠতে পারে না। তোমরাই তো এনে দেওয়া সেই লিকুইড ড্রপস্‌। ভালো ভাবেই তো খাওয়ার জলে মিশিয়ে দেওয়া হয়েছে। কোন দিনই তো আজ অবধি ঘুম ভাঙে নি। চা সামনে রেখে সকালে ডেকে তুলতে হয় সেই আটটায়—তার আগে নয়। তুমি মিছিমিছিই নার্ভাস হয়ে পড়ো। ভয় নেই—কিচ্ছু ভয় নেই তুষার—বি—ফ্রি,—রিমে-ইন হ্যাপি,—ডু অ্যাজ ইউ লাইক। নাও মুখ খোলো তো—খেয়ে নাও—একটা টেবিলস্পুন ভর্ত্তি সুগার মুখে ঢেলে দিয়ে বললো—নাও—এই গ্লাসের পুরো দুধটা খেয়ে নাও—! মেমসাহেব জানে—র‍্যাপিড এনার্জি গেইন করতে সুগাররে জুড়ি আর কিছু নেই—। বুঝালো তুষার—মেমসাহেব ক্রেভিং—। —বার্নিং হাঙ্গার—। মেমসাহেবের ভরসা মানতে চায় না, আশ্বাস বুঝতে চায় না তুষারের মন—। কি জানি ভদ্রলোক যদিই বা জেগে ওঠেন—! হি ফেইলস্‌,—বুঝতে পারে মেমসাহেব। ওঠে বেড়িয়েও আসে মেমসাহেবের কামরা থেকে—তুষার,—দম নেয়—ভাবে রিক্স বড্ড রিক্স্—।

* *

—ব্রাভো—তুষার—ব্রাভো,—। কনগ্রেচুলেশন মেমসাহেব,—হাতখানা একটু ঝাঁকিয়ে ছেড়ে দিতে দিতে বলছিলো মিঃ সেন—।

হ্যাপি মোমেন্টস—মৃদু হেসে জবাব দিয়ে ছিলো মেমসাব। খানা-পিনা—হাসিঠাট্টা জমজমাট। মিঃ সেন আর মিঃ জোয়ার্দ্দারের পার্টি—তুষার আর মেমসাবকে—।

আচ্ছা—তুষার, মিঃ জোয়ারদার কেমন করে তোমার বন্ধু হতে গেলো। দেখেছো লোকটা কেমন মিট্‌মিট করে তাকায় আর পিটপিট্‌ করে কথা বলে—! আর দেখলে তো কেমন করে পান করলো। দেখতেই মনে হয়—প্রিমিটিভ—লাষ্ট্রাস্।

মেমসাব অল ষ্ট্রেইট লাইনস্ আর ষ্ট্রেইট লাইন—। অল কার্ভ লাইনস্ আয় কার্ভ লাইন তাই না মেমসাব—? নাও খেয়ে নাও—তাড়াতাড়ি করো। গোলাপী হয়ে আসছে তুষার, বুঝতে পারছে মেমসাহেব।

—নাঃ—আর খাবো না—।

কেন?

—তুমি বুঝছো না তুষার। আমি বেসামাল হতে পারি না—আমাকে ফিরতে হবে ওদিকটা দরকার মতো সামলাতে হবে ভুল করলে চলবে কেনো তুষার।

চলো ওঠা যাক।

* * *

—বড্ড ইম্‌প্রেসিভ স্মাইল মিঃ সেনের, রিয়েলি তোমার বন্ধু মিঃ সেনের একটা আলাদা গ্লামার আছে, কি বলো তুষার?

মেমসাব সময়টা কেমন কাটলো?

—রিয়েলি—এ হ্যাপি কমপানিয়নসিপ।

বুঝলো তুষার—স্নিগ্ধ পান পাত্র পরিপূর্ণ পান করার অপেক্ষা—। অপেক্ষা তাকে করতেই হবে জীপটা যতক্ষণ না পৌঁছে দিচ্ছে। শহরের পার্টি থেকে ফিরছিলো মেমসাব আর তুষার।

—রাত অনেক হয়েছে তাই না তুষার?

হ্যাঁ তাই। ঘড়িটার দিকে তাকিয়েছিলো তুষার।

*　　　*　　　*

একদিন যে মেছুনী মেয়েদের কাছে পেত্নি ছিলো আজ "অ-লা-এ-যে ভাড়াটে বাড়ীর বৌ-লা। আর উ-তো বামুনদের বাড়ীর ছেইল্যা।" প্রথম প্রথম দীঘির পারে মেছুনী মেয়েদের দেখে গা ঢাকা দিতো মেমসাব ঝোপের পাশে, কঁড়ে ঘড়ের পিছনে—এখন আর দেয় না।

একদিন লোকের মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়েছিলো চাষ বাড়ীতে ভুত আছে। গভীর রাতে মাঠে ঘুরে বেড়াতে দেখা যায়। চাষ বাড়ীটা নাকি তৈরী হয়েছে কবরের উপর—তাই গভীর রাতে চাষ বাড়ীর ঘরে আওয়াজ হয় যেন হাসছে—কথা বলছে—আবার কখনও পায়ে হাঁটার শব্দ। চাষ বাড়ীর পাহাড়ওয়ালা—থম বাহাদুর—প্রথম প্রথম চোখ বুজে পড়ে থাকতো ভয়ে ভয়ে। কিছুদিন পরে জেগে থেকে দূর থেকে দেখতো জোড়া ভূত ঘুরে বেড়ায় মাঠময়— হাসছে —ছুটছে-বসছে-শুয়ে পড়ছে। ভয় পেতো কাছে যেতে সাহস হতো না—থম বাহদুরের। যেদিন কুলি সর্দ্দার ছেনু বাওরীকে ভুত দেখাতে নিয়ে এসেছিলো থম বাহাদুর—সেই রাতেই তো বুঝতে পারলো ওরা ভূত নয়—থম বাহাদুরের—মাইজি—আর ছেনু বাওরীর মা ঠাক্‌রান সঙ্গের ভূত বাবু লয় বামুন বাড়ীর সেই লোকটা। সেই থেকে মেমসাব থম বাহাদুরের মৌসী আর ছেনু বাওরীর মাসী হয়ে গেলো।

এরপরও সাবধান হয়নি মেমসাহেব—বেপরোয়া মেমসাব। তুষার—তুমি কি পারো না আমাকে সরিয়ে নিয়ে যেতে দূরে-বহুদূরে। ভেবোনা তুষার—; আমার কাছে যা আছে তাতে করে চলে যাবে বেশ কিছু দিন—তারপর তুমি একটা কিছু দেখে নিও। চলো আর কোথাও চলে যাই—। যা ঘটে গেছে এরপর আর একদিন এক-মুহুর্ত্তও নয় যেখানে হোক যেমন করে হোক। —কি অতো করে কি ভাবছো তুষার—?

মেমসাব চলো তোমাকে দুর্গাপুরে আমার একজন বন্ধুর ওখানে

আপাততঃ রেখে আসি। আমি রোজ যাবো-যতদিন না বদলি নিয়ে দুর্গাপুরে আসছি। তারপর মাঝে মাঝে বাড়ী এলেই চলবে। ব্যাস এদিকটা ম্যানেজড। কিন্তু তোমারও তো একটা দিক আছে মেমসাহেব, —মিঃ রায়ই বা ছেড়ে দেবে কেন? সে তোমাকে খুঁজে বেড়াবে-থানা পুলিশ করবে—, ব্যাপারটা ভয়ানক জট পাকিয়ে যাবে,—সে সব তুমি ভেবেছো মেমসাব?

—না-তা-হতে দেয়া যায় না। ব্যবস্থা নাও তুষার। তোমার আমার মাঝখানে আর কিছু দাঁড়াতে দিতে পারি না—দেবো-না।

—একটাই পথ আছে—পারবে তুমি?

—কি তুষার?

—চিরদিনের মতো সরিয়ে দিতে!

—তুমি যদি আমার পাশে থাকো আমার হাত শক্ত করে ধরে রাখো তাহলে কেন পারবো না তুষার। নিঃশ্চয়ই পারবো—পারতে আমাকে হবেই। মেমসাব বদ্ধপরিকর—কঠিন হয়ে উঠেছে মেমসাহেবের মুখটা, চক্‌চক্ করছে চোখ দু'টো।

—তাই হবে মেমসাব—হিংস্রতায় কঠোর গম্ভীর স্বর, চোখ দৃঢ়তায় স্থির। মেমসাব জড়িয়ে ধরে চোখে চোখ রাখলো তুষারের। মেমসাব—, যে কোন একটা দিন ঠিক করে নেবো। রাত একটার পর তুমি শুধু আওয়াজ পেলে দরজাটা খুলে দিও; তারপর যা করার ঠিক করবো—তবে তোমার চোখের সামনেই কিছু ঘটবে না, আমরা ওকে নিয়ে যাবো। পরের দিন তুমি একটা কথাই বলবে—অফিস থেকে বাড়ী ফিরে এসেছিলো। খেয়ে দেয়ে আবার বেড়িয়ে গেছে—বলে গিয়েছিল ফিরতে একটু রাত হবে—। ব্যাস, এর বেশী কিছু বলবে না। হাজার জিজ্ঞাসা করলেও না, কাউকে না, কোন অবস্থাতেই না, মনে থাকবে?

হ্যাঁ থাকবে।

*　　*　　*

মিঃ রায় একজন ভাগ্যাহত স্বামী, দুর্ভাগ্য নেমে এসেছিলো তার উপর, তারই আপনজনের যৌন অপরাধের জড়িয়ে নেওয়া আরও বড় বড় অপরাধের শিকার হয়ে পরেছিলো মিঃ রায়। এ্যান ইনোসেন্ট ভিকটিম্-এ্যান ইনোসেন্ট সাফারার, দুঃখজনক—।

মিঃ রায় কি তখনও জানতেন ঔষধ প্রয়োগে তাকে ঘুম পাড়ানো হয়, তার ঘুমকে নিবিড় থেকে নিবিড়তম পর্য্যায়ে ঠেলে দেয়া হয়।

মিঃ রায় কি তখনও জানেন ঔষধ প্রয়োগে তার যৌন গ্রন্থিগুলি অকেজো করে দেয়া হচ্ছিলো।

মিঃ রায় কি তখনও জানতেন —ঔষধ প্রয়োগে তার কিডনী সম্পূর্ণ-ভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হতে আর অল্প বাকী !

মি রায় কি তখনও জানেন—কালো মৃত্যুর অতল গহ্বরে তাকে ঠেলে দেবার গভীর ষড়যন্ত্র পাকা!

যৌন অপরাধ সামাজিক অপরাধ আর তা আরও বড় বড় অপরাধকে জড়িয়ে পঙ্কিল পথ ধরে আর তা হয়ে উঠে বিভীষিকাময়। অপরাধের নিজস্ব কোন রূপ নেই কিন্তু প্রকৃতি আছে আর আছে একটা নিজস্ব গতি। গতি আর প্রকৃতি এ সবই নির্ভর করে পরিপার্শ্বিক অবস্থা আর ঘটনার উপর। যৌন অপরাধের যেন নিজস্ব একটা রূপও আছে কেননা ইহা আদিম ঈর্ষা সঞ্জাত।

পৃথিবীর অনেক বড় বড় অঘটনইতো ঘটে গেছে এই যৌন অপবাধ থেকে। কত যে শিশু অসহায় হয়ে পড়েছে তার কি কেউ হিসাব রাখে। কত যে নিরাপরাধ হতভাগা নর আর হতভাগিনী নারী শিকার হয়ে পড়েছে আপনজনের যৌন অপরাধের জীবন যন্ত্র-নায় তাদের কাতরাতে হয়েছে আমৃত্যু আমরণ, কেই বা কার খোঁজ রাখে বা জানে। কত যে নিরাপরাধ জীবন মাশুল গুনছে আপনজনের যৌন অপরাধের—তা কালো কফিনে ঢাকা অব্যক্ত—অপ্রকাশ্য—গাঢ় অন্ধকারের কবরে পুড়ে দেওয়া আছে অনাদি অনন্ত কালের জন্য—কেউ জানে না আজও—কেউ জানবে না কোন দিন।

সমাজ এখানে সজাগ শান্ত্রী নয়—। জ্বলে যাওয়া বারুদ ফুরিয়ে

যাওয়া আতশবাজীর নিম্নগতি-শীলতার চাইতেও অধিক ক্ষিপ্রগতি-শীল বিধ্বস্ত বিবেকই নাকি সভ্যতা সংবহ—। সমাজ সভ্যতার শাস্ত্রী—। —ভাবতে গিয়ে অসহায় বোধ করেছিলো মিঃ রায় যখন সে জানতে পেরেছিল বুঝতে পেরেছিল কেমন করে কি হলো।

স্যাটার্ন দ্য প্রিন্স অব দি ওয়ার্ল্ড—এ ব্যানিসড গড। আমাকে প্রণতি জানাও—পৃথিবীকে ভোগ করো যেমন করে খুশী—যেমন করে পারো। গোপনতা—? সেতো আমার দেয়া চাবি কাঠি। আর সুরক্ষা—? সেতো আমারই দেয়া নির্দেশ। আমি বায়ুর চাইতে বেগবান—বিদ্যুতের চাইতেও ক্ষিপ্র গতিশীল। আমি ধমনীতে ধমনীতে চলি—প্রতি শিরা উপশিরায় বিচরন করি—রক্তে রক্তে বহন করে আমারই বিজয় বার্তা— করে—আমারই জয়গান। দেহ—আমার,—জীবন সেখানে বন্দি। পৃথিবীটা আমার—স্বর্গের দেবতাদের নয়। প্রণতি জানায় মেমসাহেব—প্রণতি জানায় তুষার—রোজদিন—প্রতিদিন—স্যার্টার্ণ দ্য প্রিন্স অব দি ওয়ালর্ড।

নিয়তি ন বাধ্যতে। জীবনগুলো আমার দেয়া—আমার। ফিরিয়ে নেবার মালিকও আমি—আমিই নিই যখন নেবার তখনই নিই—তার আগে নয়—পরেও নয়। বিধি নিয়ম—বিধাতার। বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের অধিশ্বর—সৃষ্টির নিয়ন্তা—স্বর্গের দেবাদিদেব প্রভু পরমেশ্বর—এক আর অভিন্ন।

—আজও প্রভু পরমেশ্বরকে প্রার্থনা জানায় মিঃ রায়—আমার জীবন বীণারে তুমি এমনি করে বাধো প্রভু—যেন তোমারই সুর ঝঙ্কারে—এই বিশ্ব মাঝারে—প্রভু তোমারই সুর ঝঙ্কারে।

শরতের বিকেল—লিপিকার সঙ্গে দেখা হয়েছিলো। মিঃ রায়ের এক মিশন মবালাইজিং ক্যাম্পে। খবর নিতে গিয়েছিলো মিঃ রায় রেভারেণ্ড অধিকারীর। তিনি এই তো দিন তিনেক আগে কোলকাতা থেকে এসেছেন একটা বিশেষ প্রোগ্রাম কনডাক্ট করতে।

তিনি বেরিয়ে গেছেন—ফিরতে রাত হবে। আপনি বরং

রোববার আসুন—সকালে গীর্জায় দেখা করুন, তিনিই তো এই রোববারের গীর্জা নেবেন কিনা। আপনি গীর্জা চেনেন তো ?

না—।

—বড় লাইব্রেরীর পাশে—তিন রাস্তার মোড়ে।

আচ্ছা—খুঁজে নেবো –

—কটায় গীর্জা আরম্ভ হয় জানেন ?

না—।

—সকাল আটটায়। আপনি কোথা থেকে এসেছেন ?

কোলকাতা থেকে—।

—রেভারেণ্ডকে আপনি জানেন— ?

না—।

—রোববার আসুন—রেভারেণ্ডের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবো। এখানে কোথা উঠেছেন ?

থানা শহরে এখান থেকে পঁয়ত্রিশ কিলোমিটার দূরে। বেড়িয়ে এসেছিলো মিঃ রায়—ছোট্ট লনটা ছাড়িয়ে বড়ো গেটটা পেরিয়ে বড়ো রাস্তার ওপর। মিঃ রায়ের রিক্সা অপেক্ষা করছিলো,—উঠতে যাচ্ছে মিঃ রায়—পেছন থেকে শুনতে পেলো—"শুনুন"—। পেছন পেছন বেরিয়ে এসেছিলো লিপিকা—মিঃ রায় বোঝতে পারে নি। রিক্সাতে একটা পা রেখে রিক্সা ধরে তাকিয়ে দেখলো—লিপিকা একদম কাছে এসে দাঁড়িয়েছে।

—আমি লিপিকা। আপনি— ?

—আমি পুষ্পেন্দু রায়। রিক্সায় চেপে বসলো পুষ্পেন্দু। আর কোনো কথা নয়—, রিক্সা ততক্ষণ বেশ খানিকটা এগিয়ে গেছে। জেলা শহরের রাস্তা তো—বাস ট্রামের হুড়োহুড়ি নেই কোলকাতার মতো, তাছাড়া শহরের এ অঞ্চলটা রেসিডেন্‌সিয়াল এরিয়া কিনা—! মানুষ টানা রিক্সা নয় সাইকেল রিক্সা—, পুষ্পেন্দু উঠে বসার সঙ্গে সঙ্গে বেশ খানিকটা দূর এগিয়ে গেছে রিক্সাটা। পিছন ফিরে কয়েকবারই তাকিয়ে ছিলো পুষ্পেন্দু—

দেখতে পেয়েছিলো লিপিকা দাঁড়িয়ে আছে—তারপর আর তাকায় নি।

রোববার সকালে পুষ্পেন্দুর এসে পৌঁছুতে একটু দেরী হয়ে গেছে—অতো দূর থেকে আসতে হয়েছে তো তাই। লনে বারান্দায় কাউকে দেখতে পেলো না পুষ্পেন্দু—সোজা গিয়ে গীর্জার ভেজানো দরজা ঠেলতেই পেছনের সারি থেকে এক ভদ্রলোক বেড়িয়ে এসে রিসিভ করে নিয়ে গেলো—পাশে জায়গা করে দিলো পুষ্পেন্দুকে। সকলেই দাঁড়িয়ে প্রার্থনা গীতি গাইছিলো—সেই সঙ্গে পিয়ানোর সুমিষ্ট সুর ও ঝঙ্কার সমস্ত গীর্জা ঘরে একটা স্বর্গীয় পরিবেশ সৃষ্টি করে দিয়েছে।

ধবধবে সাদা ক্যাসাক পরিহিত শান্ত, সৌম্য, প্রৌঢ় রেভারেণ্ড অলটারে দাঁড়িয়ে সমভাবে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেছেন নিষ্পলকভাবে প্রার্থনা রত সমস্ত নরনারীর উপর। পিছনে লম্বমান ক্রশ। সত্যি, শ্রদ্ধা আনে ভক্তির উৎস যোগায়।

পুষ্পেন্দুকে পাশের ভদ্রলোক সাহায্য করছিলো সংগীত পুস্তকের পাতা খুলে ধরে। কি জানি! পুষ্পেন্দুও গাইতে আরম্ভ করে দিয়েছিলো ওদের সঙ্গে সুর মিলিয়ে বইয়ের পাতায় চোখ রেখে লক্ষ্য করেছিলেন রেভারেণ্ড অলটার থেকে বুঝতে পেরেছিলেন—এই সেই ব্যক্তি যিনি কোলকাতা থেকে এসেছে তাকে খোঁজ করে গেছে। রেভারেণ্ড আরও বুঝতে পেরেছিলেন লোকটি—শ্রান্ত—ক্লান্ত—ভারাক্রান্ত তাই হয়তো বা চোখ বুজে প্রভুর সেই আশ্বাস-বাণী স্মরণ করছিলেন—হে শ্রান্ত ভারাক্রান্ত পথিক তুমি আমার নিকট আইস—আমি তোমাকে বিশ্রাম দিবো।

প্রার্থনান্তে সকলেই বেরিয়ে এলো পুষ্পেন্দু বেরিয়ে এসে বারান্দার এক কোণে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিলো, কিছুক্ষণের মধ্যেই লিপিকা এসে পাশে দাঁড়িয়ে বললো—একটু অপেক্ষা করুন রেভারেণ্ড পোষাক পাল্টে নিক। আমি আপনার কথা রেভারেণ্ডকে বলেছি—তিনি বলেছেন দেখা করবেন।

আপনি বুঝি মিশনের কাজের সঙ্গে জড়িয়ে আছেন ?

—না—ঠিক তা নয়। আমি কলেজে পড়ি আর গীর্জা ও সমাজের জন্য যতটুকু পারি সময় দিই। —চলুন রেভারেণ্ড অতোক্ষণে নিশ্চয়ই ফ্রি হয়ে থাকবেন। লিপিকা পুষ্পেন্দুকে নিয়ে ভেষ্ট্রিতে এসে রেভারেণ্ডএর সামনে দাঁড়ালো—বললো—ইনিই কোলকাতা থেকে এসেছেন। বেরিয়ে এলো লিপিকা।

বসো—তোমার কথা লিপির কাছে শুনেছি। বার বার চোখ বুলিয়ে রেভারেণ্ড—দেখে নিচ্ছিলো পুষ্পেন্দুকে। —কি হয়েছে তোমার ?

চুপ করে থাকলো পুষ্পেন্দু—কোন কথা বললো না।

রেভারেণ্ড আবার বললেন—শোনো পুষ্পেন্দু, নিশ্চিত থাকতে পারো নির্ভর করতে পারো, স্বচ্ছন্দে বলতে পারো তোমার কষ্ট কোথায়—কেন ? কি ঘটেছে তোমার ? আমরা হয়তো তোমাকে আর কিছু সাহায্য করতে পারবো না কিন্তু প্রার্থনা জানাতে পারবো প্রভু যীশুর নিকট—তার করুণা ভিক্ষা করতে পারবো—যাচ্ঞা করতে পারবো তোমার আরোগ্য তোমার স্বাস্থ্য।

ভরষা পেলো পুষ্পেন্দু। শ্রান্ত ক্লান্ত ভারাক্রান্ত পুষ্পেন্দু, স্বস্তি নেই—শান্তি নেই—মানষিক উৎপীড়নে জর্জ্জরিত—। বিষাক্ত খাদ্যের প্রতিক্রিয়া তাকে মৃত্যুর পথে ঠেলে দিয়েছে। ব্যর্থ চিকিৎসকরা, ব্যর্থ হয়ে গেছে তাদের চিকিৎসা—তাই দিন গুনছে পুষ্পেন্দু।

ধীর ভাবে অবিশ্বাস্য সত্য ঘটনা বলে চলেছে পুষ্পেন্দু—কি সাংঘাতিক পাপ—আর কত ভয়ঙ্কর হতে পারে এই পাপীরা—। বলতে বলতে হাঁপাচ্ছিলো পুষ্পেন্দু। প্রতারণায় জিঘাংসা নয়—নিস্ফল আক্রোশের প্রতিবেদনও নয়—এ যেন এক—আর্জ্জি মহাআর্জ্জি—মহাশূন্যের দিকে—মহাশক্তির কাছে শেষ বারের জন্যে।

বোঝতে পারছেন রেভারেণ্ড, পুষ্পেন্দু জেনে ফেলেছিলো—দেখে ফেলেছিলো—পাপ আর পাপীদের, বুঝে ফেলেছিলো—

পাপীদের হিংস্র ষড়যন্ত্র—তাইতো পাপীরা অব্যর্থ নিশানায় আঘাত করে ছেড়ে দিয়েছে—পুষ্পেন্দুকে। একটা বড়ো নিঃশ্বাস বেড়িয়ে এলো রেভারেণ্ডের—, সেই সঙ্গে একটি কথা—এ্যান ইনোসেন্ট—সাফারার। পুষ্পেন্দু তাকালো রেভারেণ্ডের মুখের দিকে রেভারেণ্ডের দৃষ্টি স্থির মুখখানা থম থম করছে। চোখে চোখ পড়তে রেভারেণ্ড আবার বললেন—দুর্ভাগ্য পুষ্পেন্দু—। —ঈশ্বর বলেছেন সমস্ত আকাশমণ্ডলের নীচে—সে আলোতেই হোক আর অন্ধকারেই হোক—যা কিছু ঘটে তা সবই আমি দেখি জানি। আমার কাছে কারো কিছু গোপনীয় নেই। তাই পুষ্পেন্দু তুমি ঈশ্বরের উপর সমস্ত ব্যাপারটা ছেড়ে দাও। সান্ত্বনা আর শান্তি তার কাছে যাচ্ঞা করো কেননা সর্বশক্তিমান পিতা বলেছেন—যাচ্ঞা করো পাইবে—।

—রেভারেণ্ড, ভয়ানক দৈহিক ক্লেশ আর প্রচণ্ডতম অন্তরের দহন। ঘুম নেই রেভারেণ্ড! অনেক দিন, ঘুমোতে পারিনি—পারিনা। বড়ো কষ্ট! এর চাইতে মৃত্যুও বুঝি অধিক শান্তির। আপনি আমার জন্য অন্ততঃ কিছু করুন রেভারেণ্ড। বোঝতে পারছেন রেভারেণ্ড—পুষ্পেন্দু ভেঙে খান খান হয়ে গেছে,—দেহের তন্ত্রীগুলো বুঝি তছনছ হয়ে গেছে,—মস্তিষ্কের শিরা উপশিরাগুলো বুঝি আর কাজ করতে চাইছে না। দয়া হলো রেভারেণ্ডের—।

শোনো পুষ্পেন্দু—বাইবেলে ইনোসেন্ট সাফারারদের কথা বলা আছে—আর তাদের জন্য একমাত্র বিধান প্রার্থনা—সে নির্দ্দেশ ও লেখা আছে। —নিশ্চই আমরা তোমার নিরাময়ের জন্য প্রার্থনার ব্যবস্থা করবো। তবে জাগতিক সান্ত্বনার জন্য আমি তোমাকে দু'একটা এই জগতেরই ঘটনার কথা বলছি—দেখবে ইনোসেন্ট সাফারার-দের কত না দুর্গতি হতে পারে—যেখানে পৃথিবীর কারো কিছু করার থাকে না থাকে কেবলমাত্র ঈশ্বরে প্রার্থনা।

হিরোশিমা এ্যাটম হিটেড হলো। আচ্ছা—তারাই কি একমাত্র

ওয়ার ক্রিমিন্যাল? যারা ওয়ারের জন্য মূলত দায়ী তাদের কিন্তু কিছু হলো না। আর আজও হিরোশিমার বংশধরেরা মাশুল গুণে যাচ্ছে। —ঠিক নয় কি পুষ্পেন্দু?

হ্যাঁ—রেভারেণ্ড—। ছোট্ট করে জবাব দিলো পুষ্পেন্দু কি যেন ভাবছিলো পুষ্পেন্দু—-।

শোনো পুষ্পেন্দু—ভারত স্বাধীন হলো। ভাগাভাগি হয়ে স্বাধীন হেলো। কোলকাতার রাস্তাঘাটে ছিন্নমূল লোকগুলোকে দেখেছো তো—যেন এক গলিত মানব সভ্যতা। দুর্ভাগ্য নেমে এসেছিলো এদের—গৃহহীন, খাদ্যহীন, সম্বলহীন, সহায়হীন হয়ে জীবন যন্ত্রণায় ছটফট্ করছে। এরা কি দোষ করলো—কে দায়ী ওদের এই দুর্ভাগ্যের জন্যে—নিশ্চয়ইতো ওরা নিজেরা নয়, অথচ ভুগছে ওরাই। নয় কি?

চুপ করে শুনছিলো পুষ্পেন্দু আর কি যেন ভাবছিলো। —ঠিকই বলেছেন রেভারেণ্ড—একের পাপের মাশুল অপরকেও দিতে হয় কখন কখনও।

এবার একটু নড়ে চড়ে বসলেন রেভারেণ্ড। তারপর বললেন—পুষ্পেন্দু তুমি তোমার সমস্ত ব্যাপারটা ঈশ্বরের উপর ছেড়ে দাও। সান্ত্বনা আর শান্তি তার কাছে যাজ্ঞা করো। আমরা আগামী শুক্রবার মধ্যরাতে একসঙ্গে পাঁচটা গীর্জায় তোমার আরোগ্য ও স্বাস্থ্য কামনায় প্রার্থনা করবো। যদি নিশ্চিন্দির ঘুম ফিরে পাও নিরাময় হয়ে উঠো তাহলে বুঝবে আমাদের প্রার্থনারই প্রত্যক্ষ ফল। তেমন ঘটলে একখানা ক্রুশমূর্ত্তি তোমার শয্যার শিয়রে ঝুলিয়ে রেখো। প্রতিদিন প্রভু যীশুকে ধন্যবাদ দিও,—কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো শ্রদ্ধা নিবেদন করো। নিশ্চয়ই তুমি প্রভু যীশুর অনুগ্রহে আরোগ্য লাভ করবে। রেভারেণ্ড পুষ্পেন্দুর মাথায় হাত রেখে বললেন—যাও।

অগাষ্টের শেষ সপ্তাহের শেষ শুক্রবার মধ্যরাতে প্রার্থনা হলো গীর্জ্জায় গীর্জ্জায়—পুষ্পেন্দুর আরোগ্য আর স্বাস্থ্য কামনায়।

আশ্চর্য ফলপ্রদ হয়েছিলো এই প্রার্থনা। মধ্যরাতের পর থেকে গভীর সুপ্তি আচ্ছন্ন করে দিয়েছিলো পুষ্পেন্দুকে। পরের দিন ঘুম থেকে উঠে বোধ করছিলো কে যেন যাদু কাঠির স্পর্শে তার সমস্ত ক্লান্তি দূর করে নিয়েছে,—ভুলিয়ে দিয়েছে তার যন্ত্রণাময় অপেক্ষমান দিনগুলিকে। স্মরণে আনতে পারে না,—বিস্মৃতি অতলে ডুবিয়ে দিয়েছে দহন আর দাহ্য প্রখর ঘটনাগুলো।

এখন আর পুষ্পেন্দু একা একা বসে থাকে না অবসাদগ্রস্থের মত হয় না—আগের মতো আর সে সুরা পান করে না। স্বাস্থ্য ফিরে পাচ্ছে পুষ্পেন্দু—জীবন ফিরে পাচ্ছে পুষ্পেন্দু। দু-সপ্তাহও পেরোয় নি—পুষ্পেন্দু সম্পূর্ণ সুস্থ, সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। দেহে কোথা থেকে এলো এতো সঞ্জিবনী—এতো রক্ত আর মাংস। এক অজ্ঞাত রহস্য বিশ্বাসী করে দিয়েছে পুষ্পেন্দুকে, সে কৃতজ্ঞ-শ্রদ্ধাবনত।

ক্রুশমুর্ত্তি কিনে নিয়েছিলো পুষ্পেন্দু শয্যায় শিয়রে আজও ঝুলিয়ে রাখে—কৃতজ্ঞতার সঙ্গে ধন্যবাদ জানিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করে আর বলে—হে প্রভু জাগতিক কষ্টের কাছে তুমি নতী স্বীকার করোনি—আপোষ করো নি—সন্ধি করোনি, সহনশীলতা আর ক্ষমা রেখে গেছো ক্রুশে লম্বমান হয়ে। জগতের সমস্ত দুঃখ-কষ্ট সয়ে নেবার প্রতীক্—তুমি ভাস্বর হয়ে আজও আছো—চীরকাল থাকবে। পবিত্র আত্মার সংযোগে তুমি পরম পিতার সঙ্গে অভিন্ন—সমস্ত মহিমা ও গৌরব তোমারই।

মিঃ রায়ের জীবন দেহ বিমুক্তি ঘটেনি। অনুগ্রহ পরমেশ্বরের—কেননা তিনি চেয়েছিলেন ঐ জীবন ঐ দেহে আর নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত থাকুক সুস্থ হয়ে উঠেছিলো মিঃ রায়ের জীবন আর মন। দৈহিক ক্লেশ? দেহ—সে তো স্যাটার্নের বসত বাড়ীর প্রজা—ভেবে নিয়ে সহনশীল থাকে মিঃ রায়।

দিন—মাস—বছর। মিঃ রায় তারপরও তো দেখেছে সাড়ে ছ'হাজার বার সূর্য পূব আকাশে উঠেছে—পশ্চিমে ডুবেছে—পুরো চাঁদটাকে সন্ধ্যার পুব আকাশে উঠতে দেখেছে—একশ ষাট বার—

শিশুকে তরুণ হতে দেখেছে—তরুণকে যুবক—যুবককে প্রৌঢ়ে—প্রৌঢ়কে বৃদ্ধে বিগত হতে দেখেছে অনেক অনেককে—। আবর্ত্ত্য—মহাকালের অমোঘ।

*　　　*　　　*

ও—মাসী—একটু সরে বসতে পারো না—? একেবারে গায়ের সঙ্গে ঠেসে বসে আছো যে, ঐ তো তোমার ডান পাশে জায়গা রয়েছে—একটু সরে বসো তো—! ধমকের সুরে কথাগুলো বলে যাচ্ছিলো ঝুলপিওয়ালা—ববড্ চুল—হিপি নয়। ক্লীন সেইভড্ গোঁফ সযত্নে ছাঁটা—কিন্তু দু'পাশ দিয়ে বেয়ে নেমেছে—, বেলবটস পরা—হাতে একখানা "নিশি সঙ্গিনী"।

এতোক্ষণ উত্তাপ নিচ্ছিলো মাসী। মাসী কি যেন ভাবলো—তারপর চুপ করে সরে বসলো। মাসী ভাবছিলো—আমার যদি আগের দিন থাকতো—তাহলে ওহে ল্যাড্ আমার বলার অপেক্ষা তুমি কিছুতেই রাখতে না—ডু হোয়াট ইউ ক্যান, ইউ উইল নেভার পাস দিস্ ওয়ে এগেন—পরন্তু আমাকেই বলতে হতো প্লীজ, একটু সরে বসুন—।

একটা ইন্টারমিডিয়েট ষ্টেশন থেকে সুবারবান ট্রেনে উঠেই শুনতে পেয়েছিলো ছেলেটার কথাগুলো—তাই একবার তাকিয়ে দেখলো মিঃ রায়। সরে দাঁড়ালো যেন আর না দেখা যায়, দেখতে না পায়। পরের ষ্টেশনেই কামরা পাল্টে নিয়েছিলো মিঃ রায়। —বেচারী মেমসাব আজ জনগনের মাসী হয়ে গেছে—। —পিটি—! জীবনটাকে চুটিয়ে ভোগ করে নিয়েছে, পাপ পূণ্য মানুষের দেওয়া সংজ্ঞায় তখনও বিশ্বাস করতো না, এখন তো আর করেই না—। মাসী বাকীর কারবারে বিশ্বাসী নয় সঞ্চয়ের ধারও ধারতে চায় না—নগদ পাওনা মিটিয়ে নেয়। বাকীর দিকটা শূন্য থাকে। অ—মাসী—সরে বসো—!

প্রোষিত ভর্তিকা নিভিয়া প্রায় তিরিশে দাঁড়িয়ে,—একটা লজ্জা আর দুঃখজনক ঘটনা তাকে মা করে দিয়েছিলো তার পঁচিশে কি ছাব্বিশে। অবাঞ্ছিত অবস্থা এড়াতে পারে নি নিভিয়া তাই তো মা,—তাই তো আজ প্রোষিত ভর্ত্তিকা। ঘটনার পরিণতি—ওর কেন কারও হয়তো উপায় থাকে না—যেখানে অনিবার্য ভয়ানক নিষ্ঠুর। নিভিয়া ক্যাপটিভ—নিজের কাছে, প্রতিবেশীর চোখে—এমন কি পরিচিতির সীমানা অবধি—।

মিঃ আলিংটন যেদিন প্রথম নিভিয়ার পাশের এ্যাপার্টমেণ্টে বাস করতে এসেছিলেন তার আগেও দু'বার তাকে আসতে হয়েছিলো ল্যাণ্ডলেডি নিভিয়ার সঙ্গেই রেণ্ট কনট্রাক্ট এর ব্যাপার নিয়ে। ক'দিন আগেই নিভিয়ার প্রযত্নকারী বিদেশ থেকে এসেছে কয়েকটা দিন নিভিয়ার সঙ্গে কাটিয়ে যাবার জন্যে—আর তাই তো আলিংটনের সুযোগ হয়েছিলো ভদ্রলোকের সঙ্গে পরিচিত হবার। ভারী অমায়িক ভদ্রলোক একটু মেদ বহুল—তাতে কার আর এমন যায় আসে, যার যায় তারই আসে, যার যায় না তার আসেও না। ভদ্রলোক আলিং-টনকে রিসিভ করেছিলেন খুবই শিষ্টাচারের সঙ্গে, পরস্পরের পরিচিতি বিনিময়ের সময় তিনি বলেছিলেন—আমি মিঃ রলিনস—আপনি—?

আমি মিঃ আলিংটন হাত বাড়িয়ে করমর্দন করে নিলো ভদ্রলোক, তারপর ধীরে ধীরে বলতে লাগলো—তিনি ব্যবসায়ী দূর বিদেশে থাকেন। আগে চাকুরী করতেন—ছেড়ে দিয়ে ব্যবসা শুরু করেছেন, এইতো ক'বছর হলো আর ব্যবসা জমেছেও ভাল। নানা ব্যস্ততায় থাকতে হয় বলে অতদূর থেকে তার যখন তখন চলে

আসা সম্ভব হয় না। এইতো মাত্র দু'বছর হলো নিভিয়াকে তিনি এই আরব'ন কলোনীতে বাড়ী করে দিয়েছেন।

—আচ্ছা মিঃ রলিনস্ মিসেসকে সঙ্গে না রেখে এতো দূরে প্রবাসে কেন ওকে বাড়ী করে দিলেন? এতে তো ওর আপনার দুজনারই অসুবিধে তাই না? হাসতে হাসতেই মিঃ আলিংটন কথাগুলো বলেছিলো।

ঠিক তা নয় মিঃ আলিংটন। তাহলে বলছি—শুনুন—নিভিয়া এখানকার কালচারেই মানুষ হয়েছে তাই ওর ভালো লাগে এখানেই বাস করতে,—তাছাড়া আমার কর্মস্থল ভিন প্রদেশের কালচার ওর চোখে প্রিমিটিভ। এছাড়াও ওর বাবা মা কাছাকাছি বাস করেন কিনা—তাই ওর ইচ্ছানুসারেই ওকে বাড়ী করে দিয়েছি। —আচ্ছা মিঃ আলিংটন আমি নিভিয়ার সঙ্গে একটু আলোচনা করে দেখি সে আদৌ ভাড়াটে বসাবে কিনা—ওর কি ইচ্ছে। আপনি বরং আগামী সপ্তাহে—বলছিলাম আসছে রোববার বিকালের দিকে একবার আসুন,—আপনার জন্য কিছু করতে পারলে বরং খুশীই হবো।

ধন্যবাদ মিঃ রলিনস্—চলি,—বেড়িয়ে এলো মিঃ আলিংটন।

জীবন যুদ্ধে ক্ষত বিক্ষত, ক্লান্ত এই ভদ্রলোক কিন্তু হার মানে নি, বয়ে চলেছে এক দুর্বিসহ জীবন। মেনে নিয়েছে—তাকে বয়ে চলতে হবে। একটা প্রতারণা--মিসেস আলিংটনের প্রতারণা, চাবুক—একটা কড়া চাবুক,—তাইতো মিঃ আলিংটন কেমন একটা অস্বাভাবিক থম্থমে্ গম্ভীর হয়ে থাকেন সকল সময়ের জন্যে।

মিঃ রলিনস-এর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ফিরছিলেন। আর ভাবছিলেন মিঃ আলিংটন—সে অবিবাহিতও নয়, সে গৃহীও নয় এসব জানার পর মিঃ রলিনস হয়তো রাজি হতে পারবে না বিশেষ করে নিভিয়াতো নয়ই। কেমন করে সম্ভব—? ছোট্ট বাড়ী মাত্র দু'এ্যাপার্টমেণ্টের,—এক এ্যাপার্টমেণ্টে নিভিয়া নিজে বাস করে, ভিন্ন এ্যাপার্টমেন্ট গৃহী ছাড়া আর কাউকে ভাড়া দিতে কিছুতেই

রাজি হতে পারে না নিভিয়া। তবুও দেখা যাক্—আসতে যখন বলেছে আসছে রোববার বিকেলে। মিঃ আলিংটন আরও ভাবছিলেন যদি মিঃ রলিনস জানতে চায় তবে সবই তাকে ঢেকে ঘুরে বলবে কেমন করে কি ঘটেছিলো আর কেমন করে কি ঘটছে—তারপর সে ভাড়া দিক্ আর না-ই দিক সেইটে তার ইচ্ছে। পরে কোন কথা হোক এইটে মিঃ আলিংটন মোটেই চায় না—আর এ ব্যাপারে সে খুবই সতর্ক।

প্রথম দেখার পর থেকেই নিভিয়া ভাবছিলো—ভদ্রলোক যেন আর পাঁচজনের চাইতে কোথায় একটু ব্যতিক্রম। চাহনিতে লক্ষ্য করেছিলো ক্লান্তির এক মায়া ভরা স্নিগ্ধতা। অতৃপ্ত বাসনার চমক বিন্দুমাত্র ছিল না সে চাহনিতে বরং ক্ষীণ এক দুর্বল ভীরুতার ছায়া দেখেছিলো নিভিয়া।

নিভিয়া কেমন করে জানতে পেরেছিলো মিঃ আলিংটনের এক আন্টি এই টাউনসীপেই বাস করেন। খুঁজে বের করেছিলো নিভিয়া আন্টিকে। নিভিয়া তো এই টাউনসীপেই মানুষ হয়েছে—তাই অনেককে ও চেনে, জানে,—ওর একটুও অসুবিধা হয়নি আন্টিকে খুঁজে নিতে। এই আন্টিকে তো আরও আগে জানতো নিভিয়া। বলতে গেলে প্রতিবেশী— আর তারই চোখের সামনে মানুষ হয়েছে নিভিয়া।

এসো—এসো—নিভিয়া,—হঠাৎ কি মনে করে— ? বসো—।

—আচ্ছা আন্টি, মিঃ আলিংটন তোমাদের কে হয় ?

কে— ! —কার কথা বলছো— ? —আর্লির— ? —আমাদের আর্লিকে তুমি জানলে কেমন করে নিভিয়া— !

—কেন—এই তো দু'দিন আগে আমার বাড়ী এসেছিলেন ভদ্রলোক। আমার একটা এ্যাপার্টমেন্ট পরে আছে শুনে জানতে এসেছিলেন—ভাড়া দেবো কি—না।

আশ্চর্য— ! আমার সঙ্গে সে তো দেখা করে যায় নি—।

—না—হতে পারে না—। এখানে এলে সে আমার সঙ্গে

দেখা না করে চলে যাবে—এ কখনও হতে পারে না—। —তুমি হয়তো আর কারো কথা বলছো—নিভিয়া—।

—আমরা তাকে আবার রোববার আসতে অনুরোধ জানিয়েছি —হয়তো তিনি আসবেন।

এলে,—তুমি আমার বাড়ী নিয়ে এসো তাকে নিভিয়া—।

—হ্যাঁ,—বলবো। —কিন্তু।

আবার কিন্তু কেন নিভিয়া—? যদি তোমার অসুবিধা না থাকে—তোমার ওই অ্যাপার্টমেন্ট ওকে ছেড়ে দিও। একটা বড় করে নিঃশ্বাস টেনে নিলো আবার ছেড়ে দিলো আন্টি—। আনমনা ভাবে বলে উঠলো—মাই বয় হ্যাজ বিন ব্যারিড এলাইভ—ওর কষ্ট বেদনাদায়ক—নিভিয়া। বসো—শোনো— আর্লি প্রথম নিজে নিজে খেতে শিখেছিলো আমার হাত থেকে। প্রথম লেখা, প্রথম পড়া আমার কাছে। আর্লির শুরু আনন্দ ভরা—। ওদের পরিবার বনেদি—আর রক্ষণশীল। আর্লি বাড়ীর প্রথম ছেলে—। বল্গাহীন আর বাধাহীন ভাবে বেড়ে উঠেছিলো আর্লি। বাড়ীর আর প্রতিবেশীর অন্ধ স্নেহ আর্লিকে আরও দুরন্ত করে দিয়েছিলো। আর্লি কিন্তু এ অলিখিত নিয়মের মূল্য রেখেছিলো তার স্কুলে—তার কলেজে। সব চাইতে আশ্চর্য কি জানো নিভিয়া—? যে কোন ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে পারে খুব চটপট, আর তা প্রায়ই নির্ভুল। প্রখর ওর মেধা—তাই তো বাড়ীর বুড়ো কর্তারা ভরসা রেখেছিলো—আর্লি পরিবারের সুনাম রাখতে পারবে। হয়তো বা সেই কারণেই আর্লির প্রতি তারা ছিলো ভয়ানক কোমল। আমাদের আর্লি আজ থুবড়ে পরতে চায়,—নুয়ে পরেছে—কষ্ট—নিভিয়া, ভয়ানক কষ্ট ওর। আন্টির গলা ভারি হয়ে আসছে—চোখ ভিজে উঠেছে।

—চলি—আন্টি।

এসো—আর্লিকে বলো আমার কথা—সে যেন আমার সঙ্গে দেখা না করে চলে না যায়।

—নিশ্চয়ই বলবো—আন্টি। —চলি।

এসো নিভিয়া—।

আন্টির কথা শুনতে শুনতে নিভিয়া যেন কেমন এক অজানা অনুভূতিতে সিক্ত হয়ে এসেছিলো। —মিঃ আলিংটন— আলিংটন—আর্লি—। ভাবছিলো—আর ভাবছিলো নিভিয়া—। বাড়ী ফিরে রলিনসকে সে কোন কথাই বলেনি—কাউকেও নয়—। ক'দিন থেকেই নিভিয়া শুধু ভাবছিলো, আর ভেবেছে,—বল্গাহীন—বাধাহীন—দুরন্ত—ট্যালেনটেড্—আজ থুবড়ে পড়তে চায়—নুয়ে পরেছে—কষ্ট—ভয়ানক কষ্ট।

আসুন—আসুন মিঃ আলিংটন—হাত বাড়িয়ে স্বগত জানাল মিঃ রলিনস। নিভিয়া পাশে দাঁড়িয়ে শুধু একটু মৃদু হাসলো। আদব।

বিকেল—রোদ পড়ে গেছে, সন্ধ্যে তখনও নামেনি—। –দুঃখিত, দেরী হয়ে গেলো—তাই না?

না—ঠিক দেরী হয় নি।

—আমরা ভেবেছি আপনি আসবেন তবে হয়তো কোন কারণে একটু দেরী হচ্ছে—নিভিয়া স্বাভাবিক ভব্যতা জানালো।

আচ্ছা মিঃ আলিংটন আপনার চাকরী? ড্রইংরুমে বসে মিঃ রলিনস জিজ্ঞাসা করেছিলো। মিঃ আলিংটন বলে চলেছে তার চাকুরী, কাজের ধরণ, বদলী এসব কথা। কখন নিভিয়া বেড়িয়ে গেছে লক্ষ্য করেনি অলিংটন, কিন্তু এবার ঢুকতে দেখেছে নিভিয়াকে ট্রে হাতে। কফি আর স্ন্যাকস। কফি কাপটি এগিয়ে দিতে দিতে নিভিয়া দেখে নিচ্ছিলো অলিংটনকে, তারপর বললো—দুধ আর চিনি প্রয়োজন মত মিশিয়ে নিন। কথা কটায় যেন শিষ্টাচার জড়ানো রয়েছে মনে হলো আলিংটনের তাই একবার তাকিয়ে দেখে নিলো—নিভিয়াকে। এবার রলিনস্‌কে ডার্ক কফি পেয়ালায় চিনি মিশিয়ে দিতে দিতে এগিয়ে দিলো। সে ডার্ক কফি খায়—কতটা চিনি খায়

তা নিভিয়া জানে। নিজে এক কাপ ঢেলে নিয়ে বসলো – তাতে দুধ বেশী কফি কম।

যদি কিছু মনে না করেন মিঃ আলিংটন—আচ্ছা, আপনি একা কেন? —ফ্যামিলি? মিঃ রলিনস এর জিজ্ঞাসায় অপ্রস্তুত হয় নি আলিংটন। এমন একটা প্রশ্নের জন্য মানষিক প্রস্তুতি সে নিয়ে নিয়েছিলো। কিন্তু ঠিক নিভিয়ার উপস্থিতিতে জবাব দিতে স্বস্তি নষ্ট হচ্ছিলো—। আলিংটন একবার নিভিয়ার দিকে তাকালো দেখলো নিভিয়া একদৃষ্টিতে তার দিকেই তাকিয়ে আছে। চাহনিতে স্বাভাবিক কৌতুহল–। চোখ নামিয়ে নিলো আলিংটন, আস্তে ধীরে বলতে লাগলো—কেমন করে কি ঘটেছিলো আর তিনি একা কেন—! দ্বিধা করেননি আলিংটন—নিজেকে গোপন করার প্রয়াসও পায় নি তার কথা থেকে। বিস্ময় বোধ করেছিলো মিঃ রলিনস, আশ্চর্য্য—কেমন করে মানুষ অত সহজ হতে পারে।

মনে হচ্ছে আপনি ক্লান্ত—। বেশ খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে মিঃ আলিংটনের মুখের উপর দৃষ্টি রেখেই কথাটা বললো মিঃ রলিনস।

এবার একটু অপ্রস্তুত বোধ করলো মিঃ আলিংটন, ভাবতে গিয়ে থমকে গিয়েছিলো—তবে সে অনুগ্রহ চাইছে?

অতক্ষন নীরব হয়ে শুনছিলো নিভিয়া—কিছুই বলে নি, এবার শুধু বললো—আপনি থাকবেন। সহজ কিন্তু দৃঢ় তার দুটি কথা। মিঃ রলিনস একবার তাকিয়ে দেখলো নিভিয়াকে—। মিঃ রলিনস কোনো দিনই নিভিয়ার কোন মতামত উপেক্ষা করে নি তাই আজও সে করলো না—কারণ সে জানে নিভিয়ার ইচ্ছা অতীতে তাকে অনেক কল্যাণ এনে দিয়েছে। তাই কেবল বললো ভালো, মিঃ আলিংটন কবে আসছেন– ?

এমাসের তো আর ক'টা দিন বাকী–ও মাসের প্রথম সপ্তাহে যেকোনও একটা দিন চলে আসবো।

তাহলে বুঝি আপনার সঙ্গে আমার আর দেখা হচ্ছে না—আমি আর দিন দু'য়েক মাত্র থাকবো তারপর চলে যাচ্ছি—।

আবার কবে আসছেন—?

—ওর কথা বলবেন না, ওর কি কোনো কথার ঠিক থাকে—না রাখে? রলিনসকে কথা বলার সুযোগ না দিয়েই বলে চলেছিলো নিভিয়া—, শুধু কাজ আর কাজ, পয়সা আর পয়সা, কি যে এক পয়সা বানানোর নেশায় ওকে পেয়ে বসেছে—।

হেসে ফেললো রলিনস—বললো ওর কথায় কান দেবেন না, আচ্ছা প্রতিষ্ঠা তো নিতেই হবে আর নিশ্চিতও হতে হবে—একথা নিভিয়া কিছুতেই বুঝতে চাইবে না—বলুন তো মিঃ আলিংটন!

এগুলি ওদের পারিবারিক কথা—মতামত রাখতে পারছিলো না না মিঃ আলিংটন, একটু শুধু হেসেছিলো—, দুবার করে নিভিয়ার দিকে তাকালো—মনে হচ্ছিলো রলিনসের কথায় নিভিয়া একটু লজ্জা পেয়েছে লজ্জাভো ছিল তার চাহনি—তাইতো চোখে চোখ পরতেই দৃষ্টি নামিয়ে নিয়েছিলো নিভিয়া। মিঃ আলিংটন ভুল করে নি—।

আপনার আন্টি খবর পাঠিয়েছে আপনাকে অব্যশ্যই দেখা করার জন্য—।

আন্টি কি করে জানলো আমি এখানে এসেছি—আশ্চর্য্য, কতোকাল আন্টিকে দেখি না—আমাকে পেলে সে ভারি খুশি হবে। উঠি—।

আপনি দু'তিন তারিখ নাগাদ আসছেন তো—? একটু বন্ধুত্বের সুর ছিলো রলিনসের এই জিজ্ঞসায় বুঝতে পারলো আলিংটন।

আপনি কি ছাব্বিশ তারিখেই চলে যাছেন মিঃ রলিনস—? জিজ্ঞাসায় কৃতজ্ঞতার ছাপ রয়েছে বুঝতে পেরেছিল রলিনস।

আপনার সৌভাগ্য কামনা করি—আচ্ছা চলি মিঃ রলিনস্।

আপনার সময় শুভ হোক প্রতি উত্তরে রলিনস বলেছিলো আলিংটকে, তারপরেই বললো আচ্ছা আসুন মিঃ আলিংটন। একটা স্মিত হাস্যে বিদায় জানাছিলো রলিনস। আলিংটন একবার তাকিয়ে দেখে নিলো নিভিয়াকে মনে হচ্ছিলো খুশী—দু'পা এগিয়ে আবার পেছন ফিরে তাকালো আলিংটন—দেখেছে নিভিয়া একটু গম্ভীর হয়ে গেছে, আর ওরা ঠিক আগের মতো পাশাপাশি দাঁড়িয়ে নেই। চলে এসেছিলো আলিংটন।

তিন তারিখেই উঠে এসেছিলো মিঃ আলিংটন তার নূতন এ্যাপার্টমেণ্টে। নিভিয়া তাকে সাহায্য করেছিলো ল্যাণ্ডলেডি হিসাবে। নিভিয়াই লোক নিয়োগ করে দিয়েছিলো তার ঘরের কাজ-কর্ম দেখে দেবার জন্য—। বুঝিয়ে গুছিয়ে দিয়েছে সমস্ত কাজকর্ম। তাই সে কাজে নজর রাখে—দরকার হলে খবরদারিও করে। প্রথম প্রথম মহিলাটি কিছু ভাবতো না। পরে যখন বুঝতে পারলো দিদিমণি কাজবুঝে নেয়—আদায় করে নেয়, তখন ভাবলো দাদাবাবু ভাড়াটে—দিদিমণির কেউ আত্মীয় নয় তো—! সে তো আরও বাড়ীতে কাজ করছে কোন বাড়ীর দিদিমনিরাতো ভাড়াটাদের জন্য অতটা দেখতে যায় না। অনেক দিন বলবো করেও দিদিমণিকে বলতে সাহস করে নি মহিলাঠি,—তারপর একদিন হঠাৎ জিজ্ঞেস করে বললো—আচ্ছা দিদিমণি দাদাবাবু তোমার কে হয়—?

সহ্য করতে পারেনি নিভিয়া, কোন জবাব দিলো না শুধু বললো সন্ধ্যায় চলে যাবার আগে আমার সঙ্গে দেখা করে যাস, বুঝলি—? সারাদিন অস্বস্তিতে কাটিয়েছে নিভিয়া। সন্ধ্যার মুখে নিজেই ডেকে এনে বলে দিলো আজ মাসের আঠারো তারিখ—এই নে পঁচিশ টাকা আছে দেখে নে পুরো মাসের মাইনে। কাল সকাল থেকে আর আসতে হবে না তোকে এ বাড়ীতে। আর কোন কথা বললো না শুনলেও—না—উঠে গেলো ওখান থেকে। বেচারী হেল্লিংহ্যাণ্ড—বেচারী ঝি—।

অফিস থেকে ফিরে আর্লিংটন ঘরে বসে জুতোর লেস খুলছিলো, —নিভিয়া ঘরে ঢুকেই জানালো আমি দুঃখিত আপনার হেল্পিং হ্যাণ্ডকে আমি বিদেয় করে দিয়েছি।

কেন—? চুরি টুরি করে নি তো ?

—না।

তবে—?

—চুরি করলেই বুঝি তাড়াতে হয় নইলে বুঝি তাড়াতে নেই।

তাহলে কি হয়েছে—?

—হবে আবার কি,—যে ঝি চাকর বাড়ীর ব্যাপারে উৎসুক হয়, বাড়ীর আবরু মেনে চলে না তেমন ঝি চাকর আমি মোটেই পছন্দ করি না—।

তেমন কিছু হয়েছে কি—?

—আপনি পুরুষ মানুষ, মেয়েরা মেয়েদের ভালো বোঝে—বুঝলেন তো ?

কি বলতে চাইছে নিভিয়া কিছু বুঝে উঠতে পারলো না মিঃ আর্লিংটন। বেশ তো কেটে গেল কয়েকটা মাস,—কেটে যাচ্ছিলও। কত উদ্বেগহীন হয়ে এসেছিল জীবনটা, হোটেল—মেস থেকে পরিত্রান পেয়েছিলো আর দৈনন্দিন জীবনেও একটা শৃঙ্খলা বোধ ফিরে পাচ্ছিলো আর্লিংটন। আবার হয় হোটেল নয়তো কোন অবলিগেশন, বিরক্তিতে ভরে যাচ্ছিল মনটা।--প্লীজ, আর একটা লোক একটু তাড়াতাড়ি করে দেখে দিন।

—হ্যা তাতো দেখবোই, তবে নির্ভরযোগ্য লোক না পেলে আর কাউকে এ বাড়ীতে ঢোকাবো না।

সে তো অনিশ্চিত ব্যাপার।

—হলোই বা, আপনার অসুবিধা না হলেই তো হলো—।

তা তো বুঝলাম, কিন্তু অবলিগেশন তো—!

—না হয় একটু জড়ালেনই বা—মুখ টিপে হাসলো নিভিয়া।

যেমন চলছিলো তেমনই চলছে আর্লিংটনের বরং তার চাইতে

আরো ভালো, যত্ন রয়েছে, আন্তিরও আছে। দেখতে দেখতে এর মধ্যে-ন' মাস সময় কেটে গেলো আর্লিংটন এখন বেশ সুস্থ বোধ করছে—। নিভিয়ার চোখে আর্লিংটন এখন জীবন্ত।

শনিবারের বিকেল, বাড়ী ফিরে আর্লিংটন বিশ্রাম নিচ্ছিলো ইজি চেয়ারটায় নিজেকে এলিয়ে দিয়ে চলতি ইলাস্ট্রেটেড খানা দেখছিলো। —এই নিন চা, ট্রেটা নামিয়ে চায়ের কাপটা এগিয়ে ধরতেই আর্লিংটন ইলাসট্রেটেড খানা নামিয়ে নিয়ে তাকালো নিভিয়ার মুখে—চোখে, একটু মৃদু হেসে বললো—বসো—। আর্লিংটনের এই হাসিতে ধন্যবাদ সূচিত হলো বুঝতে পারে নিভিয়া—। নিভিয়া নিজের কাপটা হাতে নিয়ে একটা চেয়ার টেনে নিয়ে আর্লিংটনের কাছে এসে বসলো, একটু হেসে জিজ্ঞেস করলো—মনে পরে আপনি যেদিন প্রথম এ বাড়ীতে এসেছিলেন—?

হ্যাঁ, পরে।

—এখন কেমন, নিভিয়ার কথাটা শেষ করতে দিলো না আর্লিংটন. বললো ইয়েস, হিলিং—নিভিয়া। পরোক্ষ পরিচর্য্যার ফল বুঝতে পারে— আর্লিংটন তাই তো কৃতজ্ঞতা ভরা তার এই অভিব্যাক্তি।

—এ নিয়ে প্রতিবেশীর মন্তব্য আমার কানে এসেছে,—তার কি কোনো খবর রাখেন ?

না-তো-! আমার জন্য—তোমাকে—! না নিভিয়া আমি তা হতে দিতে চাই না—আমি বরং—।

—কেন ? প্রতিবেশীর মন্তব্যে আমি ভয় করি না—। রলিনস তো যাবার সময় আমাকে বলেই গেছে—আপনার যেন কোন অসুবিধ না হয়। আর কেউ যদি কিছু জানতে চায় বলে দিও আমার বন্ধু আর আমিই তাকে ভাড়াটে রেখে গেছি। ব্যাপারটা সম্পূর্ণ আমার—আমাদের। তাতে কার কি এমন মাথা ব্যাথা থাকতে পারে ?

প্লীজ, উত্তেজিত হয়ো না নিভিয়া—আমাকে ব্যাপারটা ভাবতে দাও। নারী ঈর্ষা কাতর। নারাসহজাতবৃত্তি-বিধর্মীকে সব নারীরাই

ঘৃণা করে, এমন কি এক বিধর্ম্মী অপর বিধর্ম্মীকেও। আশ্চর্য্য এই নারী সত্ত্বা। দ্যাট ক্রেইভস্ দ্যাট জিল্টস। দ্যাট জিল্টস দ্যাট ক্রেইভস।

প্রথম দেখার পর থেকেই দ্রবিভূত হয়েছিলো নিভিয়ার মন জন্ম নিয়েছিলো এক অনুকম্পার। আর্লিংটন কিছু দিন এ বাড়ীতে বাস করার পর নিভিয়ার অনুকম্পার রূপ নেয় শ্রদ্ধা বিজড়িত কর্ত্তব্যে, বুঝিবা এই শ্রদ্ধা বিজড়িত কর্ত্তব্য জন্ম দিয়েছে ভালোবাসার—তাই তো আজ প্রতিবেশীর মন্তব্য সহ্য করতে পারে না নিভিয়া। একটা বিপর্য্যস্ত মানুষের পরিচর্য্যার দায়িত্ব যদি সে নিয়েই থাকে তবে এমন অন্যায় সে কি করেছে—তাছাড়া তার প্রযত্নকারী যখন তাকে বলেই গিয়েছে—তবুও মানুষের দেওয়া গণ্ডি—মানুষের দেওয়া সীমা—। কোথায়—! নিভিয়াতো গণ্ডীর মধ্যেই রয়েছে, সীমার কাছেও যায়নি—ছাড়ানো তো দূরের কথা—। সমর্থন, অবচেতন মনের সমর্থন—। আর্লিংটন ভাবতে ভাবতে কখন ঘুমিয়ে পরেছিলো বুঝতে পারে নি।

কে—?

—চুপ,—আমি—।

জিরো পাওয়ারের নীল বাল্বটা সারারাত ধরে জ্বলে আর্লিংটনের শোবার ঘরে—তাই চোখ খুলেই দেখতে পেয়েছিলো নিভিয়া বুকের উপর ঝুঁকে পরেছে মুখের কাছে মুখ নিয়ে এসেছে।

তুমি কেমন করে এলে—?

—কেন—! ভেতরের দরজা খুলে—।

আর্লিংটন ভেবে আশ্চর্য্য হচ্ছিলো—! সে জানতো দরজাটা স্থায়ী ভাবে বন্ধ, আর তার খোলা বন্ধ করার ব্যবস্থা তো ওপাশ থেকেই।

—শোনো আর্লি,—আমি অনেক ভেবেছি দীর্ঘ ন মাস ধরে ভেবেছিলাম তুমিই আমায় বলবে—আশা করেছিলাম—অপেক্ষা করেছিলাম কিন্তু বললে না তো—!

নিভিয়ার মুখে প্রথম আর্লি, ডাক—প্রথম তুমি সম্বোধন—আর

এই পরিবেশ—সত্যি বিহ্বল করে দিয়েছিলো আর্লিকে। নিভিয়ার কথাগুলো তাকে অক্টো পাশের মতো বেঁধে ফেলতে চাইছে—কিছু বলতে পারলো না আর্লিংটন।

—তুমি তো অনেক রাত অবধি জেগে থাকো, পড়াশুনা করো, —অনেক রাতে ঘুমোও আমি কতোদিন তোমাকে বুঝতে দিয়েছি আমিও ঘুমোই নি,—তুমি কিছু বুঝতে পারতে না আর্লি—?

হ্যাঁ,— পারতাম!

—তাহলে, ডাকো নি কেন?

কেমন করে বলো—! বুঝলো আর্লিংটন—নিভিয়া জয়ী হলো—। আর্লি এবার নিভিয়ার মুখ টেনে এনে নিজের চিবুকের সঙ্গে ওর চিবুক চেপে ধরে রাখলো।

নিভিয়া মাথাটা তুলে নিলো, ডান হাত আর্লির কপালে মাথায় বুলোতে বুলোতে বলে চললো—আজ এখন থেকে তোমার প্রত্যক্ষ পরিচর্য্যার ভার—ও দায়িত্ব আমি নিলাম আর্লি—। আশা করি তুমি আমাকে বঞ্চিত করবে না—তুমি আমাকে নিরাশ করবে না আমি দেখতে চাই তুমি প্রাণবন্ত—তুমি প্রাণপ্রাচুর্য্যে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছো আর মনে রেখো আর্লি, আমি তোমার বর্তমানের আশ্বাস তোমার ভবিষ্যতের প্রতিশ্রুতি—। তোমার বার্ধক্যের দিনগুলোতেও আমি যেন সহায় থাকতে পারি।

—আর্লি এবার নিভিয়ার মাথাটা নুইয়ে এনে চুমো খেলো—তারপর নিজের চিবুকের সঙ্গে ওর চিবুকটা চেপে ধরে রাখলো বেশ কিছুক্ষণ। আর্লির অনুমোদন বুঝতে পারে নিভিয়া।

যাও, ঘুমোও-গে—। আর্লি উঠে এসেছিলো দরজা অবধি—।

আশ্চর্য্য হয়ে গিয়েছিলো নিভিয়া আর্লির সাবমিশন দেখে। বংশানুক্রমে শিক্ষা আর সংস্কৃতিতেই এটা সম্ভব। আন্টিতো তাকে বলেই দিয়েছিলো—বনেদি আর রক্ষণশীল ওদের পরিবার। আর্লি এবাড়ীতে ন' মাস বাস করছে,—সেক্স-ষ্টারভড বলে তো আশোভন

কিছু দেখেনি নিভিয়া, এখন তো সে রীতিমত অবাক!—কেমন করে সম্ভব হলো আর্লির—!

একদিন, যেদিন চাকুরীর বদলির চিঠি পেলো আর্লি, বড্ড বিমর্ষ হয়ে পড়েছিলো। তার নিশ্চিন্দির দিনগুলি ফুরিয়ে গেলো বলে শঙ্কিত হয়ে পড়েছিলো—আবার সেই ক্লেশকর দিনগুলির কথা ভেবে। হোটেল—মেস— আবার সেই বিশৃঙ্খল জীবন—স্বস্তিহীন অভিশপ্ত—নিঃসঙ্গ জীবন।

—এ কি তোমার চেহারা এমন হয়েছে কেন—! তোমাকে এত ক্লান্ত মনে হচ্ছে—আর্লি কি হয়েছে বলো তো—। অফিস ফিরতেই জিজ্ঞেস করেছিলে নিভিয়া—। আর্লি কিছু বললো না শুধু চিঠিটা এগিয়ে দিলো নিভিয়ার হাতে—। পড়লো কিছু বললো না নিভিয়া চলে এসেছিলো নিজের ঘরে।

রোজকার মত আজও আর্লি ফ্রেস হয়ে অপেক্ষা করছিলো এক কাপ চায়ের জন্য—যেমন সে রোজই পায়। আজ এতো দেরী করছে কেন নিভিয়া,—নিজেই উঠে চলে এসেছিলো নিভিয়ার ঘরে—দেখলো নিভিয়া উবো হয়ে শুয়ে আছে মুখটা তার ওপাশ করে ফেরানো—ভালো-দেখা যাচ্ছিলো না। বুঝতে পেরেছিলো নিভিয়া আর্লি এসেছে তবুও একটু নড়লো না। আর্লি নিভিয়ার মাথাটা একটু ঝাঁকিয়ে দিয়ে বললো কি হলো—চা খাবো যে।

—হ্যাঁ, চলো—। উঠে এসেছিলো নিভিয়া মুখটা তার অস্বাভাবিক থমথমে হয়ে গেছে লক্ষ্য করেছিলো আর্লিংটন,—কিছু বলেনি। চা খেতে খেতে একবার শুধু জিজ্ঞেস করেছিলো—কি হলো তোমার নিভিয়া—?

—কি আর হবে বলো—। প্লীজ আজ আমাকে একটু একা থাকতে দাও—।

উঠে যাচ্ছিলো আর্লিংটন,—শোনো কিছু মনে করলে না তো—তোমার যখন খুশী চলে এসো,—বলতে বলতে আবার গিয়ে শুয়ে পড়লো নিভিয়া।

আর্লিংটন দেখলো-, বেড়িয়ে আসতে আসতে ভাবলো—খবরটা ওকে ভয়ানক বিচলিত করে দিয়েছে, ওকে একা থাকতে দেওয়াই ঠিক হবে—। সারা রাত অস্বস্তিতে ঘুম হয়নি আর্লিংটনের, তন্দ্রা এসেছে—কেটে গেছে—পাশ ফিরে শুয়েছে—এমনি করেই কাটিয়েছে সারাটা রাত।

ঘুমোয়নি নিভিয়াও—সারারাত ধরে হিসেব মিলিয়েছে—কি ছিলো—কি ছিলো না—। কি আছে—কি থাকবে না। রলিনস ভারি উগ্র—বড্ড স্পেসিফিক আর কনসেন্ট্রিক। কিন্তু আর্লি—। ভারি শান্ত—বড্ড ওয়াইড আর অ্যাবানডণ্ড। কিন্তু মিসেস আর্লিংটন যদি রলিনস এর মতো স্বামী পেতো তবে সে হয়তো জিল্ট করতো না। আব আর্লির মতো জীবন সঙ্গী পেলে নিভিয়া খুবই সুখী হতো-।

আর্লিংটন ভয়ানক ব্যস্ত হয়ে পরেছিলো তার অফিস নিয়ে, তার বদলি নিয়ে—। রেখে যাওয়া কাজ গুলোর ঝামেলা চোকানো—নূতন জায়গা কেমন হবে, কোথায় উঠবে থাকবে সে সব ব্যবস্থা করা, —নানা ঝঞ্ঝাট। নিভিয়া তাকে এ'কদিন খুব একটা একান্তে পায়নি যখনও বা দেখেছে,—বুঝতে পেরেছে—মানষিক সে তছ্‌নছ্‌ হয়ে যাচ্ছে—বড্ড ক্লান্ত মনে হচ্ছিলো আর্লিকে—। তাই দু' একটা মামুলি কথা ছাড়া আর কিছু বলে নি।

তুমি কবে চলে যাচ্ছো—আর্লি—?

কাল নয় পরশু—।

—কখন ?

সন্ধ্যায়।

—থাকার জায়গা ঠিক করেছো ?

হ্যাঁ—করেছি।

—কোথায়—?

ওখানকার এমপ্লইজ মেস—।

—কাছাকাছি কোথাও এমপ্লইজ মেস আছে বুঝি—?

হ্যাঁ—।

শুনে নিশ্চিন্ত হলো—স্বস্তি পেলো—মনে মনে খুশীও হলো—যাক্ কারো বাড়ী নয়তো—? কার চোখ কেমন করে পরবে বলা যায় না—! আর্লি লোভনীয়—। নিভিয়াতো জানে—ওর ছোঁয়াছ আবেশ আনে—ভাবতে কষ্ট হচ্ছিলো নিভিয়ার—দমটা যেন বার বার থমকে চলতে চায়—, যতক্ষণ না নিভিয়া ভাবতে পেরেছিলো—নাঃ—যেমন ভাবে সে আর্লিকে চিনেছে—জেনেছে—আর পেয়েছে—তাতে করে সে তো প্রায় নিশ্চিত—আর্লি যে পর্য্যন্ত না ভাবে—নিভিয়া ভুলে গেছে নিভিয়া কথা রাখে নি—ততক্ষণ পর্য্যন্ত আর্লি আর্লিই থাকবে। কারো কাছে মিঃ আর্লিংটন হতে গেলেও—নিশ্চয়ই যে কারো কাছে আর্লিংটন হতে যাবে না আর আর্লি তো দূরের কথা।

—শোনো, দেড় বছরেরও বেশী এ বাড়ীতে বাস করে গেলে, কোনও দিন আমার এ্যাপার্টমেণ্টে আসোনি কেবল পরশু এসেছিলে চা খাবো বলে—, কালতো চলেই যাচ্ছো—আজ রাতে আমার ওখানে খাবে। আজ তুমি অতিথি, আমার বাড়ীতে তোমার শেষ রাত—কেমন?

আচ্ছা—। একটু হাসলো আর্লি—।

—তোমার মালপত্র কিছুই তো গোছাও নি।

কিছু নেবো না শুধু স্যুটকেস আর বেডিং নিয়ে চলে যাবো ভাবছি—।

—কেনো?

সাজানো ঘরটাকে তছ্‌নছ্ করার ইচ্ছে হয় না। থাক, অবশ্যি যদি তোমার কোনো অসুবিধা না থাকে।

বুঝলো নিভিয়া—আর্লি কি বলতে চাইছে, কথা বাড়ালো না—শুধু বললো যখন যা দরকার এসে নিয়ে যেও,—আর যদি মনে করো চিঠি দিও, আমি কাউকে দিয়ে পাঠিয়ে দেবো।

তাই-হবে।

খুব করে সাজেনি নিভিয়া আজ সন্ধ্যায় তবে রোজকার চেয়ে বেশ ব্যতিক্রম—। ধূসর রঙের সীফনটার সঙ্গে ম্যাচিং স্লিভলেস—ডার্ক কফি কলারের লিপষ্টিক মেখেছে খুব সতর্কতার সঙ্গে, মাস্কারা লাগিয়েছে—কাজল পরে নি—। কানে দুটো পোখরাজ– আর হাতে বড়ো ডায়মণ্ডের আংটিটা–। অকেশন ছাড়া বড়ো একটা পরে না। হাল্কা ভায়লেট সোয়ডে জরি কাজ করা চটি—; শ্যাম্পু করা চুল গুলো খুব যত্ন করে ক্লীপ এটে বাগে রেখেছে—। কে বলে সাজে নি—! আর্লি তো দেখে অবাক, হেসে জিজ্ঞাসাও করেছিলে– কত সময় লেগেছে ?

—ভ্যাট্,—মেয়েদের সব খবর ছেলেদের জানতে দিতে নেই।

দুঃখিত—।

—যাঃ, বলো খুশী হলাম—। হাসলো নিভিয়া—হাসলো আর্লিংটন।—একটা মিষ্টি গন্ধ পাচ্ছো তাই না আর্লি,—বলো তো কিসের—?

ঠিক বলতে পারছি না--তবে রেয়ার সেণ্ট.

হাসলো নিভিয়া—বেশ খানিকক্ষণ হাসলো— তারপর বললো—ভুলে যাবে না তো—?

ভুলবার নয়—।

–ঠিকতো–?

জানি না—হাসলো আর্লিংটন। হাসছিলো নিভিয়াও, বুঝতে পারছে নিভিয়া আর্লি প্রাণবন্ত—সফল পরিচর্য্যা। এক বিশেষ সুখানুভুতি আর গর্ব তাকে আবিষ্ট করে ফেলতে চাইছে—উঠে এলো আর্লির চেয়ারের পাশে—ওর মাথাটা একটু টেনে নিজের গায়ের সঙ্গে চেপে ধরে রাখলো—চুলে আঙ্গুল চালিয়ে দিতে দিতে বললো—আর্লি, ঘটনা আমাদের বিচ্ছিন্ন করে দিচ্ছে—, আমার কি সংশয় হয় জানো?—তুমি আবার ভারাক্রান্ত হয়ে পরবে—নুয়ে না পরো।—আমি কিছু দিনের জন্য এখানে আর বাস করছি না– রলিনস এর কাছে চলে যাবো।

আর্লির মুখটা যেন থম্‌থমে হয়ে এলো—! আর্লিকে দেখে বোঝা যায়—অসহায় বোধ করছে আর্লি।

—ভোবোনা—তোমার ভবিষ্যৎ দিনগুলো নিশ্চিত করার জন্যই আমার এ যাওয়া, অন্য কিছু ভেবো না আর্লি—। বুঝি তোমার মানষিক পীড়া—কায়িক ক্লেশ—সব বুঝি, তুমি ধীর ভাবে অপেক্ষা করো আমি আবার আসবো আর তা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব—বিশ্বাস রেখো—নির্ভর করো।

কিছু বলে নি আর্লি, চুপ করে ছিলো ভাবছিলো—'প্রতিশ্রুতি'—। চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে পড়লো আর্লি, একদম কাছাকাছি-মুখোমুখি,—অপলক দেখছে নিভিয়াকে আর ভাবছে—আশ্বাস—।

নিভিয়া বুঝতে পারছে আপ্লুত আর্লির নীরব ভাষা—আমার ভালোবাসা—আমার হারানো ভালোবাসা। শুনতে পেলো নিভিয়া—আমাকে বাঁচতে দাও, আমাকে আর মানুষের মতো বেঁচে থাকতে সাহায্য করো নিভিয়া।

হিমেল সন্ধ্যা—আর্লির বিদায় লগ্ন। নিভিয়া বেদনা বিধুর—মথিত, নীরব—নিশ্চল—নিষ্পলক দৃষ্টি রেখে ধীরে এগিয়ে এলো আর্লির একেবারে কাছে মুখোমুখি দু' হাত বাড়িয়ে আকর্ষন করলো আর্লি নিভিয়াকে—কাছে আরও কাছে। এবার নিভিয়া তার মাথা এলিয়ে দিলো আর্লির বুকের উপর—হাত দু' খানা ততক্ষণে উঠে এসেছিল আর্লির বুকের দু' পাশ দিয়ে দুই কাঁধে। চুপ—নিশ্চুপ—দু'জন দু'জনার নিশ্বাসের আওয়াজ পাচ্ছে—স্পর্শ পাচ্ছে—আর তার ভাষা ওরা দু'জনাই বুঝতে পারছে। এ ভাষা ওদের কতো পরিচিত, কতো নিজস্ব আর তার গোপনতা সে শুধু ওরাই জানে।

কন্‌কনে শীতের অন্ধকার সন্ধ্যা—শেষ বিদায় ক্ষণ। কালো স্যুট পরা আর্লিকে ওভার কোট পরিয়ে দিতে সাহায্য করছিলো নিভিয়া—ব্রেষ্টফোল্ড ধরে জলভরা চোখে বলেছিলো ক্ষমা করো—

আশীর্বাদ করো। আর্লি দু'হাতে নিভিয়ার চিবুক চেপে ধরে চুমো খেলো—বললো—ভুলে যাবে না তো ?

বিদায়ের প্রথম পদক্ষেপে কান্নায় ভেঙ্গে পরে ছিলো নিভিয়া—। ফিরে থমকে দাঁড়িয়ে রুমাল দিয়ে চোখ মুছিয়ে দিলো আর্লিংটন—মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে বললো—ছিঃ অমন ভেঙ্গে পরতে নেই—আবার আমরা মিলবো। তোমার শুভ হোক —বিদায়—। ধীর পদক্ষেপে অন্ধকারে মিলিয়ে গিয়েছিলো— মিঃ আর্লিংটন।

কথা রাখোনি—বেইমান—বেওয়ফা—ঝুট—ধোকা বাজ—দু'-নম্বরি—একদমে বকে গিয়েছিলো অহিন। এফুট থেকে ছুটে গিয়ে ও ফুটে তনুদির সামনা সামনি দাঁড়িয়ে পরেই হঠাৎ বকতে শুরু করে দিয়েছিলো অহিন। দূর থেকে অহিন কি করে লক্ষ্য করেছিলো তনুদিকে। দশমাস পরে—হ্যাঁ, দশমাসেরও বেশী হয়ে গেছে তনুদি গা ঢাকা দিয়ে আছে আশ্চর্য্য মেয়ে তনুদি। কেনই বা অহিনকে মিথ্যা বলেছিলো,—প্রবোচিত করেছিলো—প্রভাবিত করেছিলো—হ্যাঁ—তনুদি প্রতারনা করেছে অহিনকে, ভুল বুঝিয়ে সঙ্গ নিয়েছে অহিনের। তনুদি কেবল নাকি অনিশদার কাছে অবলিগেটেড—এর বেশী কিছু নয়। যদি তাই হবে তবে গা ঢাকাটা ওখানেই বা কেন—? তনুদিকে যদি বাধ্য করানো হয় এই দশমাসের রোজ নামটা খুলে ধরতে, ছাড়? —তনুদি তুমি দু'নম্বরি তুমি দাগাবাজ,—এছাড়া আর কি বলা যেতে পারে তনুদিকে। এই ফুটে দাঁড়িয়ে অহিনের বন্ধু সুরানা দেখছিলো, শুনছিলো আর ভাবছিলো এসব কথা। লোক জড়ো হয়ে যাচ্ছে,—যা-তা- কেলেঙ্কারি ঘটতে যাচ্ছে—ছুটে গিয়ে সুরানা অহিনের হাতটা ধরে একটা হ্যাচকা টানে বের করে নিয়ে এলো—ভীড় থেকে। চলমান ট্যাক্সিটাকে দাঁড় করিয়ে এক রকম জোড় করেই অহিনকে ঠেলে তুলে নিলো সুরানা—।

ভিড়ের মুখে তনুদি অসহায় ভাবে অপমানিত, ম্রিয়মান হয়ে—পরেছে—ভিড় কাটিয়ে এক পা দু'পা এগোতে চেষ্টা করেছে। কিছু লোকের আস্ফালন—কিছু লোকের অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি আর কিছু লোকের কৌতুহলি জিজ্ঞাসা ঘিড়ে ফেলেছিলো তনুদিকে, আর

কিছু নয়– । ভিড় কাটিয়ে একটা রিক্সা পেতেই উঠে পরেছিলো তনুদি—, আর তাকায় নি পেছন ফিরে ভিড় কেমন করে হাল্কা হলো —মিলিয়ে গেলো ওরা কেউ জানলো না।

সুরানা অহিনকে নিয়ে সোজা ওর বাড়ী চলে এসেছিলো—, ঘরে ঢুকেই ছিট-কিনিটা এঁটে দিতে দিতে সুরানা বলে উঠলো—আচ্ছা অহিন, তোকে নিয়ে কি কাণ্ডটাই না হতে যাচ্ছিলো,—একবার ভেবেছিস ?

—কি আর হতো—?

আচ্ছা—লোকগুলো যদি তোকে ঘিরে ধরতো, চেইজ করতো তুই কি করতিস ?

কেন, শুনি—? মহিলার গায়েতো হাত দেই নি, অশালীন কিছু বলিও নি—যা বলেছি তাতো নেহাৎ ব্যক্তিগত ব্যাপার। এ সবের জবাবতো ওর দেবার কথা আমি কেন লোককে দিতে যাবো ?

বাঃ-রে লোকগুলো বুঝি তোকে ছেড়ে কথা বলতো ?

রানা তুই বুঝছিস্ না—। শুধুতো তাকে অভিযোগ করা হয়েছে,—এর বেশী কি বল— ?

হ্যাঁ—অনেক বেশী। তুই কিনা একটা স্ক্যাণ্ডাল করলি— ! একটা স্ট্রীটসিন ক্রীয়েট করলি— ! ভাবতো তোর তখনকার স্ট্যাণ্ডার্ডটা—তুই নিজেই লজ্জা পাবি—। ব্যক্তিগত ব্যাপার সবারই কিছু না কিছু থাকতে পারে আর তার প্রতিক্রিয়া কম বেশী হতে পারে—তাই বলে তুই যা করলি— !

—তুই জানিস্ না রানা—তনু একটা ক্রীমিন্যাল।

তুই খুব উত্তেজিত হয়ে পড়েছিস অহিন—।

—হ্যাঁ ঠিক তাই, তুই বিশ্বাস কর রানা—সী জিল্টেড মি—।

বল না ; বিশ্বাস করি,—বুঝলামও—তাই বলে তোর অভিব্যক্তির ধরণটা আমি মেনে নিতে পারছি না—। তাছাড়া কিছু ভুল ভ্রান্তি তোরওতো থাকতে পারে !

—অ্যাবসার্ড—রানা; বাজে বকিস না। তুই-ই বল—কেমন করে সম্ভব অতো দীর্ঘ সময় ইগনোর করে থাকা, কার পক্ষে সম্ভব? তুই আমাকে বলে বোঝাতে পারবি না।

আঃ—অহিন তুই বড্ড বেশী সিরিয়াস হয়ে পড়েছিস্—বড্ড বেশী ইমপরটেন্স দিয়ে ফেলেছিস।

—তুই বুঝেও বুঝতে চাস না আমার অবস্থাটা—।

বুঝবো না কেন, বেশ বুঝি অহিন,—তুই সিনসিয়ার ছিলি আর এখনও সিনসিয়ার—তাই অতো করে বকতে পারছিস।

—হ্যাঁ; তাই—।

তাই বলে তনুদি সিনসিয়ার নয়—ইগনোর করেছে—জিল্ট করেছে—এসব কথাগুলো তুই ঠিক ঠিক প্রমাণ করতে পারবি?

—রানা; আর কি প্রমাণের অপেক্ষা রাখবে? —আর কোথাও নয়—একেবারে অনিশদার কাছে—। টানাটানা কথাগুলোর মধ্যে যেন একটা যন্ত্রণার রণন ছিলো—।

ডোণ্ট বি সীলি—অহিন—। শোন অহিন—সুযোগ না দিয়ে এক তরফা সিদ্ধান্ত নেয়া কত যে নির্বুদ্ধিতা তাতো তুই নিজেও জানিস—?

—তুই কি বলতে চাস রানা—?

আমি বলছিলাম বোঝাপড়ার একটা সুযোগ দেয়া আর নেয়া তারপর যদি না-ই হয় তাহলে তো একটাই পথ—সোজা, ক্লীন কাট একটাই কথা—স্যরি, স্যরি ইণ্ডিড.—ব্যাস চেপে যাও।

—রানা, তুই বলতে পারিস মানুষ সভ্যতার এ পর্য্যায়ে পৌঁছতে কত বছর সময় লেগেছিলো—?

দেখ অহিন বাজে বকার ইচ্ছা আমার আদৌ নেই—তুই কি করতে চাস্ বল?

—তুই তো আমার কথা ভেবেই এসব বলছিস্—, তনু যদি তা মনে না করে?

আমার তো মনে হয় তনুদি ভয়ানক-ভাবে আগ্রহী হয়ে আছে—।

বাজে কথা —। কবে সে শহরে ফিরে এসেছে তা পর্যন্ত জানতে দেয়নি, আর তুই কিনা ভাবছিস আগ্রহী, —অসম্ভব!

আচ্ছা অহিন—আমি যদি তনুদির সাথে দেখা করি তাতে তোর কি অমত আছে —?

মর্যাদায় প্রশ্ন—। দেখতে পারিস, —তবে মনে হয় ভুল করতে যাচ্ছিস — ।

পরের দিন দুপুরে—তনুদির পুরানো ঠিকানায় চলে এসেছিলো —রানা। ভেজানো দরজা একবার নক্ করেই ঢুকে পরে ছিলো—বলতে গেলে অচমকা— । দেখলো – তনুদি দোলনাটাকে দোলাচ্ছে আর ঘুমপারানীর গান গাইছে। থমকে গেলো রানা,—তনুদিও রানাকে দেখে থেমে গিয়ে বললো – রানাদা তুমি! —কি মনে করে বলো— ?

তনুদি কালকেকার দুঃখজনক ঘটনার জন্য ক্ষমা চাইতে এসেছি— ।

ওঃ —এই কথা—বসো রানাদা— ।

—এতো দিন তুমি অহিনের খবর নাও নি কেন তনুদি— ?

এসব কথা বলার মতামত বুঝি বন্ধুর কাছ থেকে নিয়ে এসেছো রানাদা.—আর তুমিই বা কি করে আশা করলে আমি তোমাকে এসব কথার জবাব দেবো।

—না তনুদি, আমি জবাব চাইতে আসিনি—তুমি বিশ্বাস করতে পারো— ।

দুঃখজনক রানাদা,—অহিন এতো নীচে নামতে পারে—ভাবতেও আমার কষ্ট হচ্ছে রানাদা— ।

—আচ্ছা তনুদি তুমি কবে ফিরে এসেছো – ।

এইতো পরশু দিন, এসে দেখি ঘরটা বাস করার অযোগ্য হয়ে আছে। পুরানো ঝিটা এ বাড়ীতে আর কাজ করে না তাই নিজে হাতেই পরিস্কার পরিচ্ছন্ন করতে হচ্ছিলো, খুব ব্যস্ত ছিলাম। একটু

সময় করে কাল বেরিয়েছিলাম মানিকের জন্যে একটা ফিডিং বোতল আর তুটো তোয়ালে কিনতে।

—মানিক— !

হ্যাঁ—আমার মানিক—।

—ওর বয়স কি হলো— ?

এই তো তু'মাস পেরিয়ে তিন মাসে পড়লো।

চুপ করেছিলো রানা—কোন কথা বলেনি—গম্ভীর হয়ে গিয়ে কি যেন ভাবলো—। ভাবছিলো—তনুদি শহর ছেড়ে চলে গেছে দশমাস—মানিকের বয়স তিনমাস—তনুদির শহর ছেড়ে যাওয়ার সাতমাস পরে তনুদির বাচ্চা হয়েছে—তনুদির শহর ছেড়ে চলে যাওয়ার আগের দিনেও তো অহিনের সঙ্গে মেলামেশায় কোন ব্যতিক্রম জানা নেই—। আচ্ছা তনুদির, চাকুরিটা রি-ইনস্টেড করে নাও, ম্যাটারনিটি গ্রাউণ্ডে কোন অসুবিধা নেই—।

না—তা নেই—তবে অসুবিধা আছে বৈকি—। ম্যাটারনিটি গ্রাউণ্ড বলতে হলে অহিনের একটা মতামতের দরকার আছে,— —তা কালকের ঘটনার পর আমি ভাবছি ফিরে চলে যাবো—। চাকুরী করবো না। এই শহরে আর বাসও করবো না।

—সে কি তনুদি ?

হ্যাঁ তাই—।

—কোথায় যাবে— ?

কেন অনিশদার ওখানে—।

আবার চুপ করে থাকলো রানা বেশ কিছুক্ষণ, ভাবছিলো ক' বছর আগে এই অনিশদাকে নিয়ে তনুদিকে নিয়ে কি স্ক্যাণ্ডেলটাই না হয়েছিলো পাড়ায় পাড়ায়,—পরিচিত মহলে। হঠাৎ একদিন চাকুরী নিয়ে এই শহর ছেড়ে বহুদূরে চলে গেলো অনিশদা। যাবার সময় অনিশদার নিকট বন্ধু সুপ্রিয়কে বলে গিয়েছিলো—আমি তনুর প্রেসটিজ নিয়ে টস্ করতে দিতে পারি না। ঠিক-ঠিক যা নয় তাই যেন এষ্টাব্লিস্ হতে যাচ্ছে। পিকচার থেকে বহুদূরে চলে

যাওয়া ছাড়া তনুর প্রেষ্টীজ সেইভ করার আর কোন রাস্তা আমি খুঁজে পেলাম না। সে বিব্রত না হোক এটাই আমি চাইছি—। সেই যে অনিশদা চলে গেলো—আর ফেরেনি এই শহরে।

তনুদি, যদি কিছু মনে না করো, যদিও তোমাদের নেহাৎ ব্যক্তিগত ব্যাপার,—আমি তোমাদের দু'একটা ব্যাপার জানতে চাইবো—খোলা মনে বলবে— ?

বলবো—। কেনো বলবো না—। তুমি তোমার বন্ধুর শুভানুধ্যায়ী – নিশ্চয়ই বলবো—। বলো কি জানতে চাও– ?

—তনুদি, মনে হচ্ছে অহিনের হিত হোক এটাই তুমি চাইছো—।

নিশ্চয়ই রানাদা—। অহিনের অহিত চিন্তা করা অসম্ভব— –আমার পাপ—আমার মানিকের অকল্যাণ—আমার তুহিনের অমঙ্গল—।

কি বললে তনুদি,—তুহিন— !

হ্যাঁ—তুহিন—, অনিশদা মানিকের নাম দিয়েছে—তুহিন—। ভারী আদর করে অনিশদা ওকে—।

সব গোলমাল হয়ে যাচ্ছে—কিছু যেন ঠিক বুঝে উঠতে পারছে না রানা। বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে থাকলো তারপর বললো— এক্সকিউজ মি তনুদি।

কথাটার কোথায় যেন একটা জিজ্ঞাসার ছাপ রয়েছে বুঝতে পারলো তনুদি। —না বুঝবার কি আছে রানাদা—আমার মানিক –অনিশদা নাম দিয়েছে তুহিন—এতে না বোঝার কি থাকতে পারে—। শোনো রানাদা অনিশদাকে আমি বিশ্বাস করতাম—এখন তো করিই। বিশ্বাসের সুযোগ সে কোনো দিন নেয় নি—আর কোনও দিন নেবেও না শুধু বিশ্বাস কেন—আমার মানিকের ব্যাপারের পর আমি নির্ভর করি।

—আশ্চর্য—! আছা তনুদি, চটকরে তুমি কোলকাতা ছেড়ে চলে গেলে কেন— ?

তারও প্রয়োজন ছিলো রানাদা—। একটা অনিবার্য্য অবস্থা থেকে অহিনকে মুক্ত রাখার জন্যেই আমার কোলকাতা ছাড়া—। ওকে কোনো কিছু না জানতে দিয়ে না বুঝতে দিয়েই আমার এই চলে যাওয়া —। শেষ পর্য্যন্ত অবস্থা এড়াতে পারলাম কোথায়—? জীবন সংশয় হয়ে পরলো—। ডাক্তারকে তো আর ফাঁকি দেওয়া যায় না—! আনিশদা কিন্তু আজ অবধি এনিয়ে আমাকে একটা কথাও বলে নি,—জিজ্ঞেস ও করে নি,—কোনো দিন আর করবেও না; বরং আমিই একদিন অহিনের কথা তাকে খুলে বললাম—। কি বলেছিলো জানো রানাদা—?

—কি—?

শুনেছি সত্যি অহিন ভালো ছেলে—তাছাড়া ওদের পরিবারও তো খুব বনেদি—তা তুমি অহিনকে ব্যাপারটা লুকোতে গেলে কেন—?

ও-বিব্রত হোক এটা আমি চাইছিলাম না। তাছাড়া অবস্থাটা যে আয়ত্বের বাইরে চলে যাবে-তা-কি আর বুঝতে পেরেছিলাম—?

ভুল করেছো তনু—। চিকিৎসায় তোমাদের কোলকাতা অনেক এগিয়ে।

—তনুদি একগ্লাস জল দেবে—?

জলের গ্লাস ধরিয়ে দিতে দিতে তনুদি বললো—রানাদা,-আর কি জানতে চাও বলো—।

—না তনুদি আর কিছু নয়—। তবে আমার একটা অনুরোধ রাখবে—?

কি-বলো—।

—কোনো কিছু সিদ্ধান্ত নেবার আগে তোমার আর অহিনের একবার দেখা সাক্ষাৎ হওয়া ঠিক হবে।

তেমন ইচ্ছে নিয়েই কোলকাতায় ফিরে ছিলাম—কালকের ঘটনায় সে ইচ্ছা আমাকে ছেড়ে দিতে হয়েছে—আমি দুঃখিত রানাদা—। অহিনের কাছে আমি তনু চিরদিনই হয়তো তনুই

থাকবো—আমার কাছেও আমি তনু ছিলাম কিন্তু আজ আমি মা—, মানিকের মা—ভুহিনের মা-: আমার এমর্য্যাদাকে ভুল করলে চলবে না তো—। তুমি-অহিনকে একটা কথা বলে দেবে— ?-বলো-আমি তনু বলেছি—'পুরুষ-অসহিষ্ণু'।

—তনুদি, রিয়ে'ল আমার আর কিছু বলার থাকতে নেই— চলি-তনুদি।

এসো রানাদা,—প্লীজ অহিন যেন প্ররোচিত না হয়। অহিন খুশী থাক্ সুখী হোক। কেমন যেন ম্রিয়মান হয়ে যাচ্ছে তনুদি—, আস্তে ডাকলো—রানাদা, —তুমি তাকে বলবে তো—?

—কি—?

'পুরুষ অসহিষ্ণু'—।

—নিশ্চয়ই—নিশ্চিত থাকো—। বেড়িয়ে আসতে আসতে ভাবছিলো সুরানা,—'পুরুষ অসিহিষ্ণু'। ফিরে আর দেখা করেনি অহিনের সঙ্গে। সারা রাত ঘুমোতে পারে নি সুরানা,—ভেবেছে অনেক কথা—রামায়নের যুগের কথা—সীতার কথা,—লব কুশের কথা —আর ওদের প্রতিপালক মহামুনী-বাল্মীকির কথা। মহাভারতের যুগের কথা—কুন্তির কথা—কর্ণের কথা আর তার রক্ষক-পিতা অধিরথের কথা। খ্রীষ্টিয় যুগের কথা—মেরীর কথা—যীশুর কথা— আর তার পালক পিতা যোশেফের কথা।—ঈশ্বরের ইচ্ছাই পূর্ণ হোক্—বাল্মীকি মুনির ন্যায়—দর্শিতা। পিতৃত্বের ক্ষুধা—অধিরথের অপত্য স্নেহ। আমি তোমাকে হেপাজতদার নিযুক্ত করেছি যে জীবনের প্রতিটি হিসেব আমার খাতায় লেখা থাকবে। শেষ বিচারের দিন আমি কোন সাক্ষ্য নেবো না, তোমার নিষ্ঠা আর কর্তব্যবোধেরও নিকাশ করা হবে,—ঈশ্বরের অনুজ্ঞা—যোশেফের নিষ্ঠাবিজরিত কর্তব্যবোধ।

সুরানা ভাবছে আজকের যুগের কথা—দিনের কথা—তনুদির কথা—মানিকের কথা—আর ওদের আশ্রয়দাতা-আনশদার কথা অনিশদা তনুদিকে স্নেহ করে—তনুদি অনিশদাকে সম্মান দেয়, শ্রদ্ধ

করে, আর অহিনকে তনুদি ভালবাসে—। কিন্তু অহিন তুই স্টুপিড, তুই অনিশদাকে ঈর্ষা করিস, আর তনুদিকে হিংসা করিস।—প্রিমিটিভ—!—ওয়েল-অহিন কাল তোকে জবাব দিতে হবে—কোন সভ্যতার কত বয়স— ?

নী—লঙ—নীল—লঙ,—নীল—। থামস্ আপ এর সিপিং ষ্ট্র থেকে মুখ তুলে খানিকক্ষণ কিছু একটা ভেবে নিয়েছিলো - ব্রিজিটি—, তারপরই অমনি করে চেঁচিয়ে ডাকতে শুরু করেছিলো—একটু দূরে চলে যাওয়া কাউকে লক্ষ্য করে।

ভ্যাপসা গরমে সন্ধ্যার চৌরঙ্গি—বাইরের একটা ষ্টলে দাঁড়িয়ে সীপ করে নিচ্ছিলো ব্রিজিটি-একটা ঠাণ্ডা থামস আপ। ব্রিজিটি চৌরঙ্গি পাড়ার মেয়ে নয়। কিন্তু সন্ধ্যার চৌরঙ্গি—ওর মতো আরও কয়েকজনের একচেটিয়া না হলেও জমাট পশার। ব্রিজিটি পশারিণী,—ভালো পয়সা রোজগার। কোনো দিন দশটা না বাজতেই ফিরে যায়,—কোনো দিন বা রাত দু'টোয় ফিরে—বাড়ীর গেটে গিয়ে ট্যাক্সির হর্ণটা অনর্গল বাজিয়ে যেতে অনুরোধ করে ড্রাইভারকে। মাঝ বয়সের একজন মহিলা এসে দরজা খুলে দেয়। বড় বাড়ী—অনেক বাসিন্দা। গেটের আশেপাশের বাসিন্দারা প্রথম প্রথম ভাবতো-এতো রাতে কে এলো—! এখন আর তারা ভাবে না,—জানে তিনতলার সাউথ এ্যাপার্টমেন্টের সেই মেয়েটি।

থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছিলো—কাউবয় প্যাণ্ট আর মেরুন রঙের সিন্থেটিক গেঞ্জি পরা একটি সুঠাম পুরুষ। নীলঙের কানে বেজে-ছিলো—কে যেন তাকে ডাকছে-।

কি-রে-! দাঁড়িয়ে পরলি-কেন-?-চল—। নীলঙের বন্ধু বুঝতে পারে নি—, দাঁড়িয়ে পরে শো কেস দেখে কলকাতার সন্ধ্যা নষ্ট করার পক্ষপাতি সে মোটেই নয়-। সন্ধ্যাটাকে উপভোগ করতে চায় চুটিয়ে—তাই তার অত তাড়া।

—দাঁড়া—। একটু ভালো করে তাকাতেই দেখতে পেলো তার

দিকেই নজর রেখে একটি মেয়ে লম্বা পা ফেলে এগিয়ে আসছে। নীলঙের ব্রেইনটা কমপিউটারের মত কাজ করে যাচ্ছে—ভারতে এমন কে মেয়ে আছে—যে ওর নাম জানে—!—নীল বলে—ওঃ— হ্যাঁ—, সে তো একটি মেয়েই ডাকতো—ব্রিজিটি—, তার কৈশোরের বন্ধু-' সে অনেক দিনের কথা—পনেরো বছরের বেশী হয়ে গেছে। নীলঙ ইয়র্কশায়ারে চলে গেছে- তার পরে তো এই প্রথম কলকাতায় এলো—আশ্চর্য্য—! নীলঙ কোনো কথাই বললো না বন্ধুকে ;— হঠাৎ ছুটতে শুরু করলো যেন সাতশো মিটারে ছুটছে-হাজার মিটার রেসে।

ব্রিজিটি—!

—নীলঙ—!

তুমি—!

—হ্যাঁ—আমি—।

ঈশ্বরকে ধন্যবাদ। ব্রিজিটিকে কাছে টেনে চুমো খেলো নীলঙ—। আস্তে ব্রিজিটি নিজেকে আলগা করে নিয়ে বললো—ইণ্ডিয়া— ক্যালকাটা—। চলো আমার বাড়ী চলো—।

কোথায় থাকো—?

—এই তো রিপন ষ্ট্রীট—। তুমি কবে এলে—?

কাল—।

—ভদ্রলোক বুঝি তোমার বন্ধু? ছাখো আমাদের দিকে তাকিয়ে অপেক্ষা করছেন—।

চলো ওর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেই—।

—হ্যাঁ চলো—।

মিঃ গ্রীভস আমার বন্ধু সহকর্মী—। —এ আমার কৈশোরের সাথী—ব্রিজিটি।

—নমস্কার।

নমস্কার—। চলুন কোনো হোটেলে গিয়ে বসা যাক।

হ্যাঁ গ্রীভস—তাই চলো।

[২]

তাহলে গ্রীভস—আমি আজ আর ফিরছি না। ব্যাপারটা চেপে যেও। কাল সকাল ন'টায় যাবো। গুড নাইট—মিঃ গ্রীভস।

গুড নাইট—।

নীল আর কিছু বললো না, শুধু একটু হেসে বাঁ হাতটা একটু তুললো আবার নামিয়ে নিলো।

—চলো নীল বাড়ী চলো, বাইরে আর দেরী করবো না। ব্রিজিট সঙ্গ দিয়েছে নানাজনকে—নানা ভাবে,—তাদের এ্যাপার্টমেন্টে গিয়ে, ডেরায় গিয়ে, হোটেলের কামরার, কিন্তু কখনও কাউকে সে আপন এ্যাপাটমেণ্টে আজ অবধি তুলে আনে নি। —আজ—! —নীলও মনের মানুষ —আপনজন জীবনের প্রথম প্রেম— কৈশোরের ভালবাসা—চীর বঞ্চিত চীর আকাঙ্খিত পুরুষ—জীবন সাথী—আমৃত্যু আমরণের সঙ্গী—পরপারের কাণ্ডারীকে সে কাছে পেয়েছে কুড়িয়ে পাওয়া হারানো মানিকের মত—তাই, উদ্বেলিত আনন্দ—আবেশ সিক্ত পরশ—অকল্পনীয় শিহরণ—অভাবনীয় রনন—অব্যক্ত অনুভূতি উত্তাল করেছে দিশেহারা করেছে ব্রিজিটিকে—চলো নী-ল-বাড়ী— চলো।

কলকাতায় এমন সুন্দর সন্ধ্যা—তোমার সঙ্গে আজ কত বছর পরে—বলতে পারো ব্রিজিটি! চলো একটু ঘুরে ফিরে যাবো—।

তর সইছিলো না ব্রিজিটির—হারিয়ে যাওয়া স্বপ্নে পাওয়া মুহুর্ত্তের মতো মনে হচ্ছিলো ব্রিজিটির, নীল আবার কোলকাতায়— সন্ধ্যায় তারই হাত ধরে সঙ্গ দিচ্ছে তাকে—।

—কেমন মনে হচ্ছে তোমার নীলও ?

দীর্ঘকাল বন্দী বিহঙ্গ মুক্তি পেলে ঘুরে ঘুরে যদি তারই প্রতিক্ষারত প্রিয়তমাকে খুজে পায়—ঠিক তেমনি!

—নীলও—আমার নী-ল-া। চলো বাড়ী ফিরে চলো।

হ্যাঁ—চলো—। একটা আবেগ নীলকে যেন নীরব করে দিতে

চাইছে—শুধু ধরাধরি করা হাতটায় আরও একটু চাপ বেড়ে যাচ্ছিল—বুঝতে পারছিলো ব্রিজিটি।—সব অভিব্যক্তিই কি ভাষার অপেক্ষা রাখে—? বাড়ী ফিরে এসেছিলো ওরা—।

সুন্দর রাত—মধুযামিনী—ভারতীয় আপ্যায়ন—বাঙ্গালীপনায় রমরমা। নীল ভাবছে, এমন আত্তির ও দেশের কেউ জানে না—জানতে পারবে না।

—বলো-বলো—নীল,—তুমি আমাকে ছেড়ে আর কখনও চলে যাবে না—। —আঃ—নীল তুমি কত সুন্দর—। চোখ বুজে আসছে অবসন্ন হতে যাচ্ছে ব্রিজিটি। নীল নিবিড় করে নিলো আপন করে রাখলো ব্রিজিটিকে।

ব্রিজিটি,—ডাকালো নীল।

—উঁ—ছোট্ট করে সাড়া দিয়ে চোখ বুজে থাকলো ব্রিজিটি।

নীল ভাবছে—বিশ বছর আগের কথা—ছোট্ট ব্রিজিটির কথা—চঞ্চল ব্রিজিটির কথা। আজ সে মহিলা—নিজেওতো আর ছেলে নয়—আজ সে পুরুষ। ব্রিজিটির সঙ্গে তার সম্পর্কের উপর আজ যেন কেমন এক মমতা ঘেরা—আপন করা—মাদকতার কোমল আস্তরণ পড়ে যাচ্ছে।

নীল আরও ভাবছে—, কত মেয়ের সঙ্গেইতো তার পরিচয় ঘটেছে—সঙ্গ দিয়েছে-নিয়েছে—, তারা তো কেবল মুহূর্ত্তগুলোকে চঞ্চল করে তুলেছে—উদ্দাম করে দিয়েছে—তারপর যেন কালো কবরে শুইয়ে দিয়েছে। এমন করে বিশ্রামের আহ্বানতো তাকে এর আগে কেউ কোন দিন জানায় নি। এ যেন এক অপরিসীম পরিতৃপ্তি—জীবনের আস্বাদন। নেশা জাগে নীলঙের—মমত্বের নেশা। বুঝতে পারে নীলঙ—এ নেশা পাগল করা নেশা।

ব্রিজিটি,—আবার আস্তে করে ডাকালো নীলঙ। একটা হাত ব্রিজিটির মাথায় বুলিয়ে দিতে দিতে চুমো খেলো, তেমন তপ্ত না হলেও দীর্ঘস্থায়ী হলো। বুঝে নিলো ব্রিজিটি—নিলঙের সব কওয়া—সব বলা—সব দেওয়া—সব নেয়া—। চোখ খুলে তাকালো—স্থির

দৃষ্টিতে দেখলো নীলঙকে, তারপর ব্রিজিটি ছোট্ট চুমোতে সুখ চিহ্ন জানালো। মন নিয়ে দেহ—দেহ দিয়ে মন নয়, এমন করে জানতো না কোনও দিন, বোঝেও নি পশারিণী ব্রিজিটি—অনুরাগ আর আবেশ আনে পবিতৃপ্তির স্নিগ্ধতা। মনের মানুষ নীলঙ আমার নীল—।

নিশ্চয়ই তোমার খিদে পেয়েছে নীল চলো খাবে।

খেতে খেতে জিজ্ঞেস করেছিলো ব্রিজিটি—আচ্ছা নীল, তুমি কিন্তু সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবে কোলকাতায়—। তুমি যখন চৌরঙ্গি দিয়ে যাচ্ছিলে আমি তোমাকে দেখেছিলাম—কিন্তু নিজেকে বিশ্বাস করতে পারছিলাম না—তুমি—! বলতে পারো নীলঙ কেমন করে সম্ভব হলো—?

—আশ্চর্য্য ভাবে, তাই না ব্রিজিটি? হাসলো নীলঙ—। ভালোভাবে লক্ষ্য করে দেখলো ব্রিজিটি—এখনও হাসলে নীলের গালে টোল পড়ে ঠিক আগের মতো।

—কেমন করে হঠাৎ কলকাতায় এলে ব-লো—না! একটু আব্দারের সুরেই জিজ্ঞেস করেছিলো ব্রিজিটি—।

কাজ নিয়ে—।

—তুমি বুঝি কাজ করছো—কি কাজ?

ব্যবসা।

—নিশ্চয়ই তুমি আজকাল খুব বেশী ধনী হয়ে গেছো,—দেশে দেশে যখন ব্যবসা করছো! অবাক শোনালো কথাগুলো—।

না—ঠিক তা নয়। একটা সংস্থা এর মালিক।

—কিসের ব্যবসা—?

অত জেনে তোমার কি হবে বলো?

—থাক, তোমার আপত্তি থাকলে বলো না।

ঠিক আপত্তি নয়, পরে তোমাকে বলবো—সবই বলবো।

—আচ্ছা নীল, তোমার ববার মৃত্যুর পর তোমার কাকা এসে তোমাকে আর তোমার মাকে দিল্লীতে নিয়ে গেলেন তারপর কেবল

একটা চিঠিই পেয়েছিলাম তোমার—আর কোনো খবর পেলাম না। কয়েকবারই আমি চিঠি পাঠিয়েছি—কোনো জবাব আসেনি।

হ্যাঁ, তাই ব্রিজিটি,—একটা বড় করে নিঃশ্বাস ফেললো নীলভ—।

—আমার কাকা আমার মায়ের সঙ্গে পরামর্শ করে আমাকে দত্তক দিয়েছিলেন ইয়র্কশায়ারের এক ভদ্রলোকের কাছে, তিনি আমাকে খুবই আদর করেন। কয়েকদিন যেতে না যেতেই আমাকে সঙ্গে করে পাড়ি দিলেন ইয়র্কশায়ারে আর তা চিরদিনের জন্যে। সত্যিই অপ্রত্যাশিত আমার কলকাতায় আসা—ব্রিজিটি—। সংস্থার নির্দেশ, পূর্বপরিকল্পিত নয় হঠাৎ নির্দেশ। তোমার আমার দেখা অতি আশ্চর্য্যভাবে—তাই না ব্রিজিটি—?

ঈশ্বরকে অশেষ ধন্যবাদ—। আচ্ছা নীল তোমরা কবে ফিরে যাচ্ছো—?

কাল নয় পরশু। সন্ধ্যের ফ্লাইটে—।

তুমি আর ক'টা দিন থেকে যেতে পারো না—?

সংস্থা রাজি হবে না।

কি যেন ভাবলো ব্রিজিটি—তারপর আবার বললো—কাজটা তুমি ছেড়ে দাও—তোমাকে ফিরে যেতে হবে না। এখানে কাজ দেখে নেওয়া খুব একটা কঠিন নয়।

কাজটা পাওয়া যেমন সহজ ছিলো ছেড়ে দেওযাটা তার চাইতে অনেক কঠিন। আমি ছেড়ে দিতে চাইলেও সংস্থা আমাকে কোনও মতেই ছেড়ে দিতে চাইবে না, খানিকক্ষন গম্ভীর হয়ে থাকার পর জবাব দিয়েছিলো নীলঙ—। নীলঙ আবার বললো—শোনো ব্রিজিটি, কাল সারাটা দিনই কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকতে হবে, সন্ধ্যায় তোমাকে কোথায় পাবো?

—আজ যেখানে পেয়েছো, সেখানেই তোমার জন্য অপেক্ষা করবো। তুমি ক'টা নাগাদ আসবে বলো—?

আরও একটু পরে, মনে করো সাতটা—সাড়ে সাতটা।

—অপেক্ষা করবো। আর যদি সময় মতো আসতে না পারো

সোজা চলে আসবে আমার এখানে। আমি বলে রাখবো—। তুমি এখানে অপেক্ষা করো—ঠিক তো— ?

আচ্ছা— ।

পরের দিন সকালে ব্রেকফাষ্ট সেরে বেরবার মুখে বিজিটিকে জিজ্ঞেস করলো নীলঙ,—বিজিটি, তুমি আমার সঙ্গে ও দেশে যাবে— ?

—হ্যাঁ যাবো একটু থেমে থেকে কেমন আনমনা হয়ে জবাব দিলো ব্রিজিট, আচ্ছা নীল—শুনেছি তোমার ওদেশটা ভারি সুন্দর তবুও আমি তোমাকে বলছি তুমি চলে আসতে পার না—?

যত সুন্দরই হোক ব্রিজি এদেশটার মত সুন্দর নয়—। তুমি তো জানো ব্রিজি—তিব্বত থেকে তাড়া খেয়ে যখন এদেশে আসলাম এ দেশ আমাদের আশ্রয় দিয়েছে, খাদ্য দিয়েছে, পানীয় যুগিয়েছে, বসবাস কর্মসংস্থান সব কিছুই তো এদেশ আমাদের জন্য করেছে, বলতে গেলে এদেশ আমাদেরই দেশ, আমরা এদেশের স্থায়ী বাসিন্দা। এদেশের প্রতি আমার একটা কর্ত্তব্য আছে বলে মনে করি। এদেশের কোন অশুভ হোক এটা ভাবতেও কষ্ট হয়। আমি চেষ্টা করবো, কতদূর কি হবে বলতে পারছি না। ফিরে গিয়ে একবার চেষ্টা করবো চিরদিনের জন্য চলে আসতে।

কিন্তু,—নীল।

দেখা যাক, এখন চলি ব্রিজি—। ঘড়িটা তাকিয়ে দেখলো নীলঙ, তারপর বললো—বাই—। —সি—ইউ—।

[৩]

—গ্রীভস্, বার্ণাডোর খবর কি— ? পিটার লেনের সরাইখানায় ফিরে এসেই জিজ্ঞেস করলো নীলঙ।

অল কোয়ায়েট—।

—তুমি তাকে কিছু বলেছো— ?

না—

—আমার কথা কিছু জিজ্ঞেস করেছে ?

হ্যাঁ করেছে—, আমি চেপে গেছি— ।

—উৎসুক বলে মনে হচ্ছিলো— ?

না—মোটেই নয়। বার্ণাডো তো শুধু পড়ে পড়ে ঘুমোচ্ছে, শহরটা ঘুড়ে দেখবার ইচ্ছাটাও যে ওর আছে মনে হয় না।

এখন কোথায় ?

বাথরুমে—। —শোনো নীলঙ, নির্দেশ এসেছে ঠিক দশটায় স্কাই কালারের একখানা চক্‌চকে্‌ হিন্দুস্থান গাড়ী এসে দাঁড়াবে এই গেটে—ড্রাইভার পাঞ্জাবি—তুমি চিনতে পারবে তো— ?

—কেন--না—! নিশ্চয়ই পারবো।

দ্যাখো,—পকেট থেকে একখানা ভাঁজ করা ম্যাপ খুলে ধরলো নীলঙের চোখের সামনে, তারপর আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে বললো— এন, এইস, থারটি ফোর,—হিয়ার ইজ এ ফার্ম হাউস। পকেট থেকে আর একখানা ভাঁজকরা কাগজ বের করে খুলে ধরলো— বললো— পড়।

—এ্যাট সিক্‌সটি কে, এম, স্পীড ফর ফরটি ফাইভ মিনিট্‌স্‌। এ্যাপ্রোস এ্যাট লেফট হ্যাণ্ড— দি ফার্ম হাউস।

আর একখানা কাগজ খুলে ধরলো মিঃ গ্রীভস—বললো ভালো করে পড়ে বুঝে নাও।

—স্ট্রীক্‌লি ফলো আপ—ইনস্ট্রাকশন। ফার্ম হাউসে গাড়ীটা পার্ক করিয়ে দিলে স্মার্টলি নেমে সোজা উঠে গিয়ে দরজা পুস করেই ঢুকে পরবে। দেখতে পাবে একজন বাঙালি পোষাকে ভদ্রলোক অপেক্ষা করছেন—তোমাকে রিসিভ করার জন্য। কোনো দ্বিধা না করে ভদ্রলোকের হাতে পাউসটা তুলে দিও। সম্ভবত সে বিনিময়ে তোমাকে একটা কলম উপহার দেবে। ডোণ্ট বি সীলি —নিয়ে নিও। তারপরই তোমাকে নিয়ে ভদ্রলোক তার ফার্মের গরু-বাছুর, শুয়োর আর মুরগীর খোঁয়ারগুলো ঘুরে ঘুরে দেখাবে।

যেন তুমি একজন এক্সপার্ট এসেছো,—অন্ততঃ ড্রাইভার তাই বুঝে নেবে। বি-কশাস্। তারপর লাঞ্চ। ড্রাইভারের খাবার গাড়ীতেই পাঠিয়ে দেবে। সমস্ত ফর্মালিটিস একটার মধ্যে সেরে নিও। ঠিক দেড়টায় ফার্মহাউস থেকে রওনা হবে, দু'টো পনেরোতে লাইট হাউসের সামনে এসে দাঁড় করিয়েই নেমে পরে দরজটা একটু আওয়াজ করে বন্ধ করে দিলেই গাড়ীটা সোজা বেড়িয়ে চলে যাবে। হাউসের দিকে এগোতে-ই দেখতে পাবে গ্রীভস তোমার জন্য অপেক্ষা করছে। শো এর টিকিট ওর হাতে রয়েছে তুমি সোজা হলে ঢুকে যাবে অপেক্ষা করবে না বাইরে মোটেই। এরপরের ইনষ্ট্রাকশনস গ্রীভসকে দেওয়া আছে—সে জানে। ও—কে,— !

কি—বুঝতে পারছো নীলঙ ?

—হ্যাঁ— ।

সো—সিওর— ?

—সার্টেনলি, একটু হাসলো নীলঙ।

লেট—বার্ণাডো ড্রিঙ্ক এ্যাজ মাচ এ্যাজ হি ক্যান –, লেট হিম বি ডাউন ইন বেড।

—ও, সিওর,—কীপ হিম অফ।

[৪]

—গ্রীভস,—নীলঙ ডাকতেই ইশারা দিলো গ্রীভস। নীলঙের পাশে গিয়ে দাঁড়িয়ে চুপিয়ে একটা টিকিট ধরিয়ে দিয়ে বললে যাও এক্ষুনি হলের ভেতরে চলে যাও আমি পরে যাচ্ছি— । নীলঙ আর কোন কথা বলে নি, শো—আরম্ভ হওয়ার একটু পরে গ্রীভস হলে গিয়ে সীট নিলো— ।

—নির্বিঘ্নে কাজ হয়ে গেছে—কিন্তু একটু দেরী হলো—। ভদ্রলোক প্রজেকশনে রেখে ম্যাগনিফাইং গ্লাস দিয়ে হীরেগুলো দেখে নিচ্ছিলো।

কিন্তু আমরা এখানে নিরাপদ নই— ।

—কি বলছো গ্রীভস— ।

হ্যাঁ—নীলঙ— । শোনো, সন্ধ্যে সাতটার ফ্লাইটে আমি বার্ণাডোকে নিয়ে সোজা লণ্ডন চলে যাচ্ছি। শো শেষ হবার আগেই আমি হল থেকে বেড়িয়ে যাবো— । পিটার লেন থেকে বার্ণাডোকে পিক আপ দিয়ে সোজা এয়ার পোর্ট। প্যান অ্যাম এ যাচ্ছি না—বি, ও এ সির ডাইরেক্ট ফ্লাইটে বেড়িয়ে যাচ্ছি— । তুমি কাল যাচ্ছো না পরশু যাবে। তুমি প্যান অ্যাম এতেই ফিরবে। বৈরুট হয়ে যাচ্ছো। তুমি আর পিটার লেনে যাবে না। এই দু'দিন বাইরে কোথাও ঘোরাঘুরি করো না। তোমার বান্ধবির ওখানেই থেকে যেও,—তাকে জানতে দিও না, কিন্তু বুঝতে দিও তাকে—তোমার নিরাপদ যাত্রার প্রয়োজন হয়ে পরেছে— । নীলঙ,—ভদ্রলোক তোমাকে একটা কলম দেবার কথা ছিল—দিয়েছে ?

—হ্যাঁ— ।

দাও— । বার্ণাডোর কাছে রেখে নিয়ে যেতে হবে। গ্রীভস বললো—তোমাকে ধন্যবাদ নীলঙ। তোমার কাছে চলার মত কারেন্সি রয়েছে তো— ?

—না— ।

এই নাও পার্সটা রেখে দাও। তুমি আমাদের সঙ্গে লণ্ডনে ৭০ ঘণ্টা পরে দেখা করছো— । আমরা তোমার জন্য অপেক্ষা করবো— । ঈশ্বর করুন তোমার যাত্রা নিরাপদ হোক্। উঠে পড়েছিলো গ্রীভস, এখনও পাঁচটা বাজতে মিনিট তিনেক বাকি— ।

শো—চলছে, ঘড়িটা একবার দেখে নিলো নীলভ—হ্যাঁ সাতটা বেজে পাঁচ মিনিট হয়ে গেছে,—'হে ঈশ্বর গ্রীভস্ এর যাত্রা যেন নিরাপদ হয়'।

[৫]

শো চলছে আলো জ্বলেনি নীলঙ হল থেকে বেরিয়ে পড়লো—ঘড়িটা দেখে নিলো—সাতটা পনের। কাছাকাছি একটা

রেস্তোরায় ঢুকে পান করে নিচ্ছিলো—নীলঙ, হঠাৎ মনে পড়লো ব্রিজিটির সঙ্গে তার এনগেইজমেন্টের কথা। ঘড়িটা দেখলো—আর ভাবলো নির্দ্দিষ্ট জায়গাটাতে পৌছতে বড় জোর চার মিনিট। কোনো তড়িঘড়ি তো নেই-ই পরন্তু—।

কোন তড়িঘড়ি তো নেই-ই পরন্তু খুবই স্বাভাবিক পদক্ষেপে বেরিয়ে হাঁটতে শুরু করলো নীলঙ। নীলঙ জানে এ্যাপয়েন্টমেন্টে পাঁচ মিনিট জোড়া থাকে স্বাভাবিক নিয়ম মাফিক। ব্রিজিটি প্রতিক্ষায় থাকবে তারই জন্যে—ব্রিজিটি অবশ্যই থাকবে। একটু দূর থেকেই দেখতে পেলো ব্রিজিটি প্রতিক্ষারত—ব্রিজিটিও দেখতে পেলো নীলকে—হেসে এগিয়ে এলো ব্রিজিটি,—নীল 'ইনটাইম, চলো'—।

হাসলো নীলঙ—সন্ধেটা কেমন করে কাটাবে কিছু ঠিক করেছো ব্রিজি— ?

—তুমি এখন পরদেশী আমার ইচ্ছা নয়—কিন্তু তোমার ইচ্ছানুযায়ী উপভোগ কর।

চলো ব্রিজি বাড়ী চলে যাই, নীলঙের মাথায় ঘুরছিলো গ্রীভসের সতর্কতার কথা আর গ্রীভসের দির্দেশ।

হাসলো ব্রিজিটি, ভাবলো কালকের রাত,—সুখস্মৃতি—নীলকে অধির করে তুলেছে—পুনরাবৃত্তি চায় নীল—। —হ্যাঁ নীল চলো, ডিনার কি পছন্দ করো বলো—কিনে নেব।

ফিস, আই মিন্—মাছ, এখানকার মাছের কথা আমি এখনও ভুলিনি—ব্রিজি বড় বড় চিংড়ি পাওয়া যেত তোমাদের মার্কেটে,—এখনও পাওয়া যায় ?

হাসলো ব্রিজিটি। —আর কি বলো!

আর কিছু নয়। ফিসফ্রাই এণ্ড জিন্।

ব্যাস! আর কিছু নয়! —চলো মার্কেট হয়েই যাওয়া যাক। ফ্রাই এর জন্য কিছু মাছ আর নিলো বড় চিংড়ি। সেখান থেকে

বরিয়ে এলো ওয়াইনশপে,—জিন কিনে বেরতে যাবে—নীলঙ দেখলো একটা লোক তাদের দিকেই তাকিয়ে আছে। —ছাখো ব্রিজি লোকটা আমাদের অনেকক্ষণ থেকেই লক্ষ্য করে যাচ্ছিলো—মাছ কেনার সময়ও লোকটাকে দেখেছি—যতদূর মনে পড়ে রেস্তোরা থেকে বেরোবার মুখেও লোকটাকে দেখেছি। আমার মনে হয় লোকটা আমাদের অনুসরণ করছে।

থাক না—। ওরা পুলিশের লোক, রেড লাইট এরিয়াতে ডিউটি হলে ওরা খুশী থাকে। এটা-ওটা বাড়তি খাতির এরা অনেক পায়। তোমাকে ভাবতে হবে না চলো। ব্রিজিটি ভালো জানে রেড লাইট এরিয়ার হালচাল—ওর যে রোজ সন্ধ্যায় আনাগোনা তাই সে ব্যাপারটায় মোটেই গুরুত্ব দিতে চাইলো না। ও কিছু নয়—চলো নীল ট্যাক্সি ধরি বাড়ী চলে যাই।

—চলো। ট্যাক্সিতে বসে নীলঙ ভাবছিল গ্রীভসের কথা—তার সবধান করিয়ে দেয়া কথাগুলো যেন বারবার কানে বাজতে লাগলো —নীলঙ, পুলিশ আমাদের অনুসরণ করছে, সাবধান—আমি এ্যাডভান্স ফ্লাইটে বেরিয়ে গেলাম, তুমি তোমার বান্ধবির কাছে শেলটার নিও। তাকে বুঝতে দিও তোমার নিরাপদ যাত্রা একান্ত প্রয়োজন কিন্তু তাকে জানতে দিও না কি—কেন—। নীলঙের নার্ভস কেমন যেন দুর্বল হয়ে পড়তে চাইছে—বুঝতে পারছে নীলঙ। গ্রীভস যেন শেষ বিদায়ের সময় বলেছিল—এজেন্টদেরও সতর্ক নজর রয়েছে তারা সব সিচুয়েশনই কভার করবে—ভয় নেই, একটু আশ্বস্ত হতে চেষ্টা করে নীলভ কিন্তু মন যে মানতে চায় না—।

—কি নীল অমন করে চুপ করে আছো যে—। কথা বলছো না কেন? তুমি কিছু একটা ভাবছো—।

হ্যাঁ, তাই! বাড়ী চলো সব বলবো।

হঠাৎ তুমি যেন কেমন মনমরা হয়ে পড়েছো—কেন বল তো?

গ্রীভস তার সঙ্গে বার্নাডোকে নিয়ে আজ সন্ধ্যায় ফ্লাইটে দেশে রওনা হয়ে গেছে, আমি একা রয়ে গেছি।

—ওঃ—এই ব্যাপার! হাসলো ব্রিজিটি। ভালো তো—ছু'দিন বেশী বেড়াতে পারবে। আমি কিন্তু ভারি খুশী, তোমাকে আরো ছু'দিন বেশী কাছে পাবো। —তুমি?

—থাকতে পারলে তো নিশ্চয়ই আমি সুখী হবো।

গাড়ীটা হর্ন দিয়ে একটু বাঁ দিক ঘেঁষে দাঁড় করিয়ে দিল রিপন ষ্ট্রীটের সেই বড় বাড়ীটার সামনে। আশ্চর্য্য বোধ করেছিলো নীলও। ট্যাক্সিতে ওঠার সময় ব্রিজিকে বলতে শুনেছিলো শুধু—রিপন ষ্ট্রীট। এখন তো ড্রাইভারকে থামতে বলে নি—কি করে ড্রাইভার বুঝলো যাত্রী এখানেই নামবে। নীলও ভাবলো হয়তো ট্যাক্সি ড্রাইভার এই যাত্রীকে নিয়ে এর আগে অনেকবার এখানে এসেছে—আর সে জানে যাত্রী এই বাড়ীতে বাস করে।

[৬]

লেটমি ড্রিঙ্ক—ব্রিজিটি, ঘরে ঢুকেই একটা চেয়ার টেনে বসলো নীলও।

—দিচ্ছি, একটু বসো। ব্রিজিটি সব জিনিসপত্র রেখে এসে এক গ্লাস পানীয় এনে এগিয়ে দিলো নীলওএর দিকে—নাও, পান করো। তুমি অমন আনমনা হয়ে পড়েছো কেন নীল? কেমন যেন উদ্বিগ্ন মনে হচ্ছে তোমাকে!

ব্রিজি—আমি টেলিফোন করবো।

—বেশ তো করো।

কিছু না বলেই উঠে গেল নীল, পরপর ডায়েলটা ঘুরিয়ে একটু অপেক্ষা করেই জিজ্ঞেস করলো—হ্যালো—হু আর স্পিকিং?

জি—টু এইট। —ইউ?

জিরো—এক্স টু—। অবজারভেশন ও,—কে?

ও—কে, বাট সাম অ্যাপ্রিহেনশন ষ্টিল ইন এনালাইসিস। ডোণ্ট বি সিলি। অল প্রটেকশন টু বি এ্যাপলাইড হোয়াট

এভার সিচুয়েশন এরাইজে। হোল্ড দি লাইন—। —হ্যালো, এ কার উইল লিফ্‌ট ইউ রাইট বাই টু এ, এম। গেট রেডি। এনজয় দেয়ার,—এনি ওয়ে ইউ লাইক টু টিল টাইম সিডিউল্‌ড। আর কোনও আওয়াজ এলো না—ও পাশ থেকে, রিসিভারটা নামিয়ে রাখলো নীলঙ।

ব্রিজি, আর একটু পানীয় দেবে?

—নিশ্চয়ই—। এই নাও। আচ্ছা, নীল সেই যে ট্যাক্সিতে ওঠার পর থেকে তোমাকে কেমন আনমনা হতে দেখেছি, এখনও তো তুমি উদ্বিগ্ন অবস্থা কাটাচ্ছিলে—কি ব্যাপার বলতো?

হাসলো নীলঙ—কিছু নয়, ও কিছু না। শোনো ব্রিজি রাত দুটোয় আমি চলে যাবো। একটি গাড়ী এসে আমাকে এখানে লিফট্‌ দেবে। আর কটা ঘণ্টাই বা সময়, এসো আমরা উপভোগ করি, হ্যাঁ তুমি যেমন ভাবে খুশী হবে—আবার হাসলো নীলঙ। কে বলবে কিছুক্ষণ আগেও নীলঙ উদ্বিগ্ন ছিল, সমস্যাকে সহজ করে নিতে পারে নীলঙ, বুঝলো ব্রিজিটি।

—তুমি একটু অপেক্ষা করো, আমি ডিনারের ব্যবস্থা করে দিয়ে এক্ষুনি আসছি। কিচেনে এসে হেল্পিং হ্যাণ্ডকে বুঝিয়ে দিলো—আস্ত চিংড়ি ষ্টাপড্‌ করে ভিনিগারে ভিজিয়ে রাখতে আর ভেটকি মাছ হার্ড ফ্রাই না—মিডিয়াম। টেবিল সাজিয়ে যেন ঠিক ন'টার ডাকে। বেরিয়ে এসে চটপট ফ্রেস হয়ে নিলো ব্রিজিটি। এসে বললো—চলো নীল—টু বেড, বুঝতে পেরেছিলো ব্রিজিটি নীল কাল রাতের পুনরাবৃত্তি চায়।

চলো, চেয়ার ছেড়ে ব্রিজিকে নিয়ে চলে এলো পাশের ঘরে। উষ্ণতায় টগবগ করছিল নীল। ব্রিজিটিকে মুচড়ে দিচ্ছে—দুমড়ে দিতে চাইছে।

জিপারটা টেনে দিতে দিতে বললো ব্রিজিটি—চলো নীল লেট আস গো টু বেড।

আলাপন নয়—মধুর আলাপনের অপেক্ষো রাখে নি নীল,—নীল

অশান্ত—নীল উদ্বেল, নীল চাইছে ওর মত অশান্ত—ওর মত উদ্বেল ব্রিজিটিও হয়ে উঠুক। ভুল করেছে,—নীল ভুল করেছে,—সোহাগ—পূর্ব্বরাগ—শৃঙ্গারের কত আঙ্গিক—কত সহায়ক—কত পরিপূরক। পিছিয়ে পরেছে ব্রিজিটি,—নীলের আন্তরিক আহ্বান নীলের কথা ব্রিজিটিকে তেমন গতিশীল করতে পারলো না। নীলের গতিশীলতায় সঙ্গতি আনতে পারলো না ব্রিজিটি। —বুঝতে পারছে নীল রিক্ত হতে যাচ্ছে—এক্ষুণি ক্লান্ত হয়ে পরবে।

ছুটে আসা রেসের ঘোড়ার মত দম ফেলছে দম নিচ্ছে নীলও। —আমাকে শক্ত করে ধরে রাখো—নীল। নীলের মাথাটা টেনে এনে দুটো ভ্রুর মাঝখানে তপ্ত চুম্বন দিয়ে আকড়ে রাখলো ব্রিজিটি—কিছুক্ষণ। নিঃশ্বাসের দ্রুততা কমে আসছে—কমে গেছে, মাথাটা তুলে নিলো নীলও—চুমো খেলো ব্রিজিকে,—উষ্ণতা না থাকলেও তৃপ্তির স্বীকৃতি জানান দিচ্ছে এই চুমোতে। সম্ভোগ-সৃষ্টি সুখের লুব্ধতা। হিম শীতল স্নিগ্ধতায় ভরা অপরিসীম পরিতৃপ্তির নেশাবিষ্ট আবেশ ব্রিজিটিকে নিশ্চুপ, অনড়, নিস্পন্দ করে দিচ্ছিলো। দু'জন দু'জনার মুখে মুখ রেখে নীবিড় থেকে নীবিড়তম হয়ে রইলো অনেকক্ষণ, তারপর সুখস্মৃতি এঁকে দিলো ব্রিজিটি।

কোনো কথা বলছে না, কেমন যেন আনমনা হয়ে পড়ছে নীলও। সুখানুভূতির উন্মাদনা আর পরাধীন কর্মজীবনের শৃঙ্খল—দ্বন্দ্ব দ্বিধায় সমাধান খুঁজছিল নীলও। —ব্রিজিটি—আমার ব্রিজি, মাই ফেয়ার লেডি,—আদর জানালো নীলও।

—নীল, তুমি আমায় কথা দাও—তুমি আবার ফিরে আসবে।

আসবো—আর তা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এবং চিরদিনের জন্য। দ্বন্দ দ্বিধা কাটিয়ে উঠতে পেরেছে নীলও। শোনো ব্রিজি,—কোনো অনিবার্য ঘটনা যদি অন্তরায় না হয় আমি অবশ্যই চলে আসবো, তুমি নিশ্চিত থাকতে পারো।

—কথা দিলে— ?

—হ্যাঁ তাই দিলাম।

—কিন্তু; অনিবার্য্য ঘটনা বলতে তুমি কি বোঝাতে চাইছো নীল—?

শোনো ব্রিজি,—আমি তিব্বতীয়, ঘটনার আবর্তে হলাম ভারতীয় নাগরিক, তারপরে তো হলাম ব্রিটিশ নাগরিক। এখন আবার ভারতীয় নাগরিক হতে আইনগত কোনো বাধা আছে কিনা জানা নেই। তাছাড়া যিনি আমাকে দত্তক নিয়েছিলেন মিঃ স্ট্যাফোর্ড আমাকে ছেড়ে দেবেন কেন?

—আচ্ছা নীল—যদি মিঃ স্ট্যাফোর্ড তোমাকে ছেড়ে দিতে রাজি না হন তাহলে কি করবে?

তাকে আমি বুঝিয়ে বলবো—ইণ্ডিয়াতে একটা স্থায়ী ট্রেড ইউনিট খোলার জন্যে, আর আমার অ্যাপয়েন্টমেন্ট এখানেই হোক; তাতে যদি সে রাজি থাকে ভালো আর এমন হলে সব দিক থেকেই ভালো—আমার ন্যাশনালিটির প্রশ্নও উঠবে না, বা আর ভিন্ন কোনও প্রশ্ন দেখা দেবার সম্ভবনা নেই।

—যদি মিঃ স্ট্যাফোর্ড এতে রাজি না হয়?

তখন ভাবা যাবে কি করা যেতে পারে, তবে আমি তোমাকে সঙ্গে সঙ্গে এই অনুরোধও রাখছি প্রয়োজন হলে তুমি আমার ওখানে চলে যাবে, তেমন মানষিক প্রস্তুতি তুমিও নিয়ে রেখো—।

কিন্তু নীল,—ইণ্ডিয়া -জন্মভূমি—! চিরদিনের মত ছেড়ে যেতে আমার কষ্ট হবে।

কষ্ট কি আমারও হয় না ব্রিজি—! আমার মা এখনও বেঁচে আছেন—কাকা, আত্মীয়-স্বজন সবাইতো এখানেই,—আমি কি ইচ্ছা করলেও তাদের একবার চোখের দেখা দেখতে পারি—!

চুপ করে গেল ব্রিজিটি,—ভাবছে, ঘটনার প্রতিক্রিয়া পীড়ন করে —পীড়া দেয় আর তা আমৃত্যু আমরণও চলতে পারে। দুর্ভাগ্য নীলের, -অনিবার্য্য অপ্রতিরোধ্য—। সহানুভূতিশীল হয়ে পড়লো ব্রিজিটির মন, বললো—আমি যাবো নীল—তোমার কাছে যাবো। স্বজন সেখানে তোমার কেউ না থাক্—চিরদিনের সাথী হয়ে আমি

তোমারই সঙ্গে থাকবো চিরকাল। দিনে দিনে ভুলিয়ে দেবো স্বজন হারাবার ব্যথা। উপহার দেব তোমাকে আপন আত্মজ, ধরিত্রীর সুষমা তোমাকে করে দেবে মুগ্ধ বিহ্বল—। নিঃসঙ্গতা থেকে তোমাকে দেব আমি চিরমুক্তি। ভেবো না নীল—!

[৭]

ঘুমোয় নি ওরা, ছক করেছে—জাল বুনেছে শান্ত নীড়ের। স্নিগ্ধতার আল্পনা—সুখের উদ্‌ভ্রান্তি। শান্ত জীবনের অঙ্গিকার—শান্তির প্রতিশ্রুতি। কখন কেমন করে যে এই দীর্ঘ সময়টা কেটে গেল বুঝতেও পারে নি ব্রিজিটি—নীলের কিন্তু ভুল হয় নি—'রাত দুটো'—। ঘড়িটা দেখে নিলো নীল—বললো—ওঠা যাক্‌, সময় হয়ে এলো'—আর তো সাত মিনিট বাকি রাত দু'টোর,—লেট মি গেট রেডি ব্রিজি—।

কেমন যেন আঘাত খাওয়া লোকের মত বেদনার্ত হয়ে পড়লো ব্রিজিটি—প্রিয় বিদায়ের লগ্ন,—আর তো ক'টা মিনিট। চোখে জল ভরে উঠেছে ব্রিজিটির, কিছু একটা আকুতির সুরে বলতে গিয়েও বলতে পারলো না নীলকে—। বুঝতে পারলো নীল—ভেঙ্গে পড়ছে ব্রিজিটি, আঁকড়ে ধরে জড়িয়ে নিলো নীল—মাথায় হাত বুলিয়ে সান্ত্বনা দিলো—চোখ মুছিয়ে দিয়ে আশ্বাস দিলো ব্রিজিটিকে—অমন করে ভেঙ্গে পড়তে নেই—লক্ষ্মীটি! আমিতো তোমায় বলেছি হয় আমি চলে আসবো—নয়তো তোমায় নিয়ে যাবো—ইদার অব দি ওয়ান ইজ এ মাষ্ট্‌। বিশ্বাস করো—ভরষা রাখো—ব্রিজি!

তোর বিয়ে হল জানালি না তো—? সুতপা প্রথম দেখেই অনুযোগ করেছিলো সোনিয়াকে। ওদের দেখা হলো আবার এই কোলকাতায় এক বছর পরে। সুতপা বিয়ে করে বোম্বেতে থাকে ছু'বছরেরও বেশী হলো, ফি বছর আসে কোলকাতায় বৃদ্ধা মাকে দেখতে। সুতপা আর সোনিয়ার বন্ধুত্ব আজকের নয়—সেই স্কুল থেকে, একই স্কুলের ছাত্রী একই কলেজে পড়াশুনা—সহপাঠী ছিল ওরা, বন্ধুত্বও ছিলো ওদের নিকটতম আর নীবিড়তম। গেল বছর সাক্ষাৎকার সোনিয়া বলেছিলো সুতপাকে—কেমন করে একটা অবাঞ্ছিত দুর্ঘটনা তাকে মা করে দিয়েছিল। আর কি এক নিদারুণ দুর্বিসহ গ্লানিময় অন্ধকারাছন্ন জীবন তাকে বয়ে নিতে হচ্ছিলো—। একবছর আগে সোনিয়াকে স্বান্তনা দেবার মত কোন ভাষা খুঁজে পেয়েছিলো না সুতপা—শুধু বলেছিল, অবশ্যম্ভাবি অপ্রতিরোধ্য—। দুঃখজনক ঘটনা—বেদনাদায়ক তার পরিণতি—অনন্যোপায়,—সোনিয়া তুই ক্যাপটিভ হয়ে পরেছিস। আর সেই সোনিয়ার বিয়ে হয়েছে শুনে সুতপা খুশীই হয়েছিলো।

—হয়নি, সুতপা!

সেকি-রে,—আমি ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না তোদের ব্যাপার—! তোরা এক ঘরে বাস করছিস এক ঘরে ঘর করছিস—আর বলছিস কিনা বিয়ে হয় নি!

—হ্যাঁ—তাই,—পারবি—বললে নিশ্চয়ই বুঝতে পারবি—শোন বিয়ের কথা—ও—আমাকে কোনও দিন বলেনি—আমিও বলিনি, অথচ এমনি ভাবেই চলছে চলবেও। বিয়ে হলে যে এর চাইতে বেশী কিছু,—ভালো কিছু হতো তা যেন ভাবতেও পারি না।

—সে কথা বললে তো চলে না সোনিয়া—। সামাজিক রীতি বলে তো একটা কথা আছে, আর তার প্রয়োজনীয়তাও ব্যাপক—একটা সুষ্ঠ পরিচিতি আর একটা নিবিড় নিশ্চিন্তির আশ্রয় এ সবেরই তো অনুমোদন এই সামাজিক রীতি—বিয়ে।

—তা আছে—অবশ্যই আছে—সুতপা। কিন্তু কি জানিস সুতপা—সবটাই মনের ব্যাপার। সামাজিক বিয়ে হলেও পরে যদি কোনো মতের অমিল জীবন দু'টোকে বিপর্য্যস্ত বিধ্বস্ত করতে থাকে তবে সে বিয়ের আর কি দাম থাকলো,—পরস্পর সরে দাঁড়ালে হয়তো দু'জনাই বাঁচতে পারে—সে বাঁচা যত অসুখী অসুবিধারই হোক না কেন। আর যদি বলিস রেজিষ্টেশন ম্যারেজ তার বেলাতে ও ঐ একই কথা—। শুধু সহজ সরল হয় যদি উভয়েই একমত হয়—আলাদা—আর নয় অনেক হয়েছে, দায় নেই—দায় বর্ত্তানোও থাকলো না—ব্যাস। এছাড়া আমাদের দেশের আইন কানুন—কাউকে রেহাই দেয় নি—না স্বামীকে না স্ত্রীকে। একজন আর একজনের বিরুদ্ধে সুপষ্ট অভিযোগ দায়ের করতে হবে—তা প্রমাণ করতে হবে—সন্দেহাতীত ভাবে তবেই রেহাই,—বুঝলি সুতপা! প্রমাণে কিছুমাত্র দুর্বলতা থাকলে আর হলো না। কত অশ্লীল আর অশোভনও তো হতে পারে সে সব অভিযোগ আর তা কিনা জাহির করে ফলাও করে একজন আর একজনের বিরুদ্ধে নিঃসন্দেহে প্রমাণ করে দিতে হবে—আশ্চর্য্য—! এর নাম যদি সমাজ সভ্যতার আব্রু হয় তবে বেলাল্লাপানা আর কাকে বলে—বলতে পারিস সুতপা? তেমন আর করতে পারলাম না-সুতপা,—আমার শিক্ষা, সভ্যতা আর রুচি আমাকে করতে দিলো না।

তুই অনেক আবোল তাবোল বকে যাচ্ছিস সোনিয়া—। আমি কিন্তু এসব কথা শুনবার জন্য তোকে জিজ্ঞেস করিনি—বলিনি,—সত্যি আমি দুঃখিত সোনিয়া—।

না—না—সুতপা, আমার বলার ভিন্ন কোনও উদ্দেশ্য নেই। তোকে তো আমি গেলবারেই বলেছিলাম—কেমন করে একটা দুর্ঘটনার শিকার আমি হয়ে পরেছিলাম! হাজার চেষ্টাতেও আমি পরিত্রান

পাইনি। অনিবার্য্যকে রোধ করতে পারি নি—তাই তো এক অবাঞ্ছিত জীবনের অন্ধকারে ঢুকে গিয়েছিলাম। আমার বলার একটাই উদ্দেশ্য আমি এখন সুখী—। অথচ দ্যাখ আমাদের বিয়ে হয়নি তবু ও আমরা দম্পতি আমাদের দাম্পত্য জীবন—আমরা সত্যি সুখী—সুতপা, যেমন আর পাঁচজন বিবাহিতেরা সুখী হয়—হাসলো সোনিয়া কিন্তু সে হাসিতে যেন একটু বেদনা রয়েছে,—সুতপার নজর তা এড়াতে পারে নি।

খুব ভালো কথা—সোনিয়া তুই কিন্তু আমার কথা এড়িয়ে যাচ্ছিস।

এড়িয়ে যেতে চাইবো কেন সুতপা,—তুই হলি আমার সবচাইতে প্রিয় বন্ধু—এমন কি থাকতে পারে যা আমি তোর কাছে বলতে পারবো না! খানিকক্ষণ চুপ করে থাকলো সোনিয়া, দৃষ্টিটাও যেন স্থির হয়ে অছে,—বুঝতে ভুল হলো না সুতপার। কোথায় যেন একটা ভয়ানক বেদনা রয়েছে যার অভিব্যক্তি ঠিক পথ করে নিতে পারছে না তাই সোনিয়া প্রসঙ্গটা টপকে যেতে চাইছিলো।

সোনিয়া তুই আজকাল ড্রিঙ্ক করিস না—? গেল বারে দেখেছিলাম তুই ড্রিঙ্ক করতিস ; বলেছিলি—দ্যাখ, সুতপা—জ্বালা—বড্ড জ্বালা—আই ওয়াজ থ্রোন ইনটু হেল—সুতপা আমি নিরুপায়—! আজতো তুই অনেকটা কেন পুরোপুরিই সামলে নিয়েছিস। মনের মত বর পেয়েছিস—ঘর পেয়েছিস তুই তো এখন বেশ সিকিওর্ড আর পাঁচটা সুখী দম্পতির মত তোরাও সুখী।

হ্যাঁ সুতপা,—ঘায়ের বেদনা প্রলেপ দিয়ে দিয়ে শুকিয়ে দিয়েছে আমার শান্তনু, তাই আজকাল আর বেদনা কাতর হতে হয় না। ও আমাকে কি বলতো জানিস সুতপা—বলতো খুব একটা প্রয়োজন না হলে মেয়েদের ড্রিঙ্কটা এড়িয়ে যাওয়াই ভালো। সে কিন্তু কখনও আমাকে ড্রাঙ্ক হতে দেখে নি। আমরা একসঙ্গে বাস করতে আরম্ভ করেছি পর থেকে আমি ড্রিঙ্ক করি না, শান্তনুও করে না—হ্যাঁ তবে খুব একটা মানষিক ক্লান্ত না হয়ে পরলে সে ড্রিঙ্ক করে না—

আমিও তাকে কখনও দেখিনি,—তবে সে যা আমাকে বলেছে আমি তোকে বললাম।

সুতপা ভাবছিলো ঘটনা মানুষকে স্বাভাবিক থেকে বিচ্যুত করে ঠিকই—আবার ঘটনাই হয়তো স্বাভাবিক হতে সাহায্য করে মানুষকে। একটা পতনশীল নৈরাশ্য ভরা জীবন থেকে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে এসেছে সোনিয়া—নিশ্চয়ই এইটে ওর সৌভাগ্য। ওতো নিজেই বলেছে ওরা সুখী—যেমন আর পাঁচজন বিবাহিতেরা সুখী হয়—। কিন্তু ঘরকন্যার প্রশ্নে সোনিয়া যেন কেমন ম্লান হয়ে যায়—কথায় আশাহত বেদনার ইঙ্গিত থাকে।

তুই কবে মা হবি সুতপা—? তোরা বিয়ে করলি প্রায় পাঁচ বছর হতে চললো—তাছাড়া তোরা বয়সের যেখানে এসে দাঁড়িয়েছিস এরপরেও তোদের অপেক্ষা করার কিইবা এমন কারণ—।

এবার হেসে ফেললো সুতপা—ছাখ সোনিয়া ওর সন্তান ওর সংসার, ও যেমন চাইবে তেমনই হবে। ওর খুশীর প্রাধান্য আমি মেনে নিয়েছি।

সন্তানের ক্ষুধা মেয়েদের যেমন পাগল করে তোলে ছেলেদের তেমন হয় না। আমি মনে করি মেয়েদের ইচ্ছা এ ব্যাপারে মুখ্য হোক। তুই আমাকে উল্টো কথা বোঝাতে চেষ্টা করছিস—সুতপা।

তুই ভুল বলিস নি সোনিয়া—আমার ইপ্সা আমাকে উদ্বেল করে ছেড়ে দিত—আমি বড্ড ক্লান্ত হয়ে পড়তাম। ওকে প্রথম একদিন বুঝিয়ে বললাম—ও যেন ঠিক ঠিক বুঝতে চাইলো না—আমি অভিমান করলাম—রাজি হলো—দেখবি সোনিয়া আসছে বছর আমি মা হতে পারবো।

বেশ কিছুক্ষণ অপলক দৃষ্টিতে দেখলো সুতপাকে, তারপরে সোনিয়া বললো—খুশী হলাম,—তুই ভাগ্যবতী সুতপা। প্রত্যেক দায়িত্বশীল স্বামীই স্ত্রীর গ্রাহ্য যোগ্য মতামতকে অবহেলা করতে চায় না—কিন্তু ঘটনা যদি অন্তরায় হয় তবে স্ত্রীকেও স্বামীর মতামতকেই মেনে নিতে হয়—একটু কষ্ট হলেও মেয়েদের তাতে অসন্তোষ রাখতে

নেই—কি বলিস সুতপা—? শেষের কথাগুলোতে কেমন যেন—বেদনার রনন ছিলো—বুঝতে পারে সুতপা।

কি হলো তোর সোনিয়া—তুই কেন এমন করে ধীরে টেনে টেনে শেষের কথাগুলো বলছিস—?

শোন্ সুতপা—আমি আর কখনও মা হতে পারবো না। শান্তনু চায় না—তাই সে ব্যবস্থা নিয়ে নিয়েছে। কি-কেন—সবই সে আমাকে বুঝিয়ে বলেছে, আমি তার যুক্তি মেনে নিয়েছি। আব্দার—! তার উদারতা আমাকে বোবা করে দিয়েছে। সে চেয়েছিল আমার সেই ছেলেটাকে নিজের ছেলের মত আপন করে কাছে রেখে মানুষ করবে। সম্পত্তির উত্তরাধিকার ওকেই লিখে দিতে চেয়েছিলো। ছেলেটাকে পেলে বুঝি সে আরও বেশী খুশী হতো। শান্তনুকে খুশী করার জন্য আমি লোকটার কাছে ছুটেও গিয়েছিলাম। কিন্তু কিছুতেই লোকটা আমাকে তার ছেলে দিতে চাইলো না—আমি ফিরে এলাম। তুই-ই বলতো সুতপা—এরপর ওর কাছে আমার কি আর কিছু চাওয়ার বা বলার মুখ আছে না থাকতে পারে।

বাঃ-রে! তাতে কি হলো—ওটাতো একটা দুর্ঘটনা প্রসূত ব্যাপর ওদিকটা শান্তনু সম্পুর্ণ বাদ দিয়ে নতুন করে সম্পর্ক গড়ে নিতে পারলো না?

তুই ভুল বলছিস সুতপা—শান্তনু চেয়েছিল আমাকে সুখী করতে—সুখে রাখতে। কোন দুর্বলতা—কোনো চঞ্চলতা যেন আমাদের বিবাহিত জীবনে ছায়াপাত না করে। এর সম্পুর্ণ দায়িত্বই তো আমার ছিলো এবার বুঝতে পেরেছিস আমার অবস্থাটা—। আর ছাখ সুতপা ভাবলেই ভাবা যায়—আর তেমন ভাবনার কি কোন শেষ আছে, আর ভাবি না। কেন জানিস,—হিসাব আমি কোনও দিন মেলাতে পারবো না—মেলাতে গেলে নিকেষ দিতে দিতে আমি ফতুর হয়ে যাবো। সন্তানের সুষ্ঠ পরিচিতর জন্যই তো আনুষ্ঠানিক বিয়ে—এছাড়া আর কোন হেতু থাকতে পারে বলে আমি মনে করি না। ভালবাসা আইন দিয়ে হয় না—ধর্মীয় অনুষ্ঠান দিয়েও হতে

পারে না। পরস্পরের সম্পর্ক সম্পূর্ণ নিজস্ব—আর মনের ব্যাপার। সুখ বলিস—শান্তি বলিস এসবই নির্ভর করে পরস্পর সমঝোতার উপর – এছাড়া আর কি বল ?

তুই যাই বলিস না কেন সুতপা বিয়েটা হচ্ছে সভ্যতা বিকাশের আদিসূত্র। এটা বাদ দিয়ে সমাজ সভ্যতার কোনো মূল্য থাকে না। তুই কেন শান্তনুকে বিয়ের কথা বলিস নি—? অবশ্যি শান্তনুরই প্রথম বলা উচিত ছিল।

কোনো ব্যাপারে অহেতুক গুরুত্ব দেয়া কি ঠিক সুতপা—? পরিচিতি আমার সুষ্ঠ, আমি মিসেস শান্তনু চোধুরী—অফিসে, পরিচিত মহলে—। আমরা সুখে ঘর করছি। কিসের অভাব আমাদের বলতো—! আমার কোনও ক্ষোভ নেই, কোন অভিযোগ নেই—শান্তনু আমাকে ভালবাসে আমি সুখী,—আমি গর্ব্বিতা। ওর কি ধারণা জানিস সুতপা? ছেলেটা তার বাবার কাছে মানুষ হলে আমকে ঘৃণা করতে শিখবে আর ওর প্রতিও একটা অহেতুক ঈর্ষা পোষণ করতে পারে, আর আমাদের কোনো ছেলেপুলে হলে তাকে সে আপন করে কিছুতেই ভাবতে পারবে না—হিংসাও করতে পারে,— তাই ওর ইচ্ছা ছিল ছেলেটাকে পেলে কোনও ভাল মিশন স্কুলে রেখে মানুষ করে তোলা সেই সঙ্গে আমদের স্নেহের সিঞ্চন পেলে সে আমাকে তো মা বলে আপন করে নিতোই – ওকেও আপনজন বলে শ্রদ্ধা করতে শিখতো। তুই ভেবে দেখতো সুতপা, সেইটেই কি আমার পরম পাওয়া হতো না—? জানিস না সুতপা,—শান্তনু আমাকে সুখী করার জন্য সুখী দেখার জন্য কেমন ভাবে আগহী—তুই বুঝতে পারবি না সুতপা—! আমি সব পেয়েছি—আমি বাড়তি পাওনাও পেয়েছি শান্তনুর কাছ থেকে, সে যে আমাকে জীবনে ফিরিয়ে এনেছে—সুতপা —! ওর সামাজিক প্রতিষ্ঠা, আর্থিক অবস্থিতি এসবই তুই হয়তো শুনে থাকবি সুতপা,—আমি গর্বিতা—আমি সুখী—।

তোর চেহারা কিন্তু ভেঙ্গে যাচ্ছে সোনিয়া—আমি গেলবারে যা

দেখে গিয়েছিলাম তার চাইতে তো ভাল হয়নি। কোনো ভাবনা তোকে পীড়ন করে না-তো ?

করে—। তোকে সবই বলবো স্নুতপা—। আমি ফিরে এসে-ছিলাম—ছেলেকে সঙ্গে আনতে পারি নি—এ ঘটনার পরে শান্তনু নিজে নিজে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলো সে কখনও বাবা হবে না,—ব্যবস্থাও নিয়ে—ছিলো নিজে—একা। কিছুদিন ধরে দেখছি- যখন সে ভাবে সে আর কখনও বাবা হবে না তখনই সে যেন কেমন আনমনা হয়ে পরে। ইদানিং দেখছি ওর সঙ্গ লিপ্সা বেড়ে গেছে। কোনো কথা নেই তেমন কোন কাজও নেই—ঘণ্টার পর ঘণ্টা পাশাপাশি বসে কাটিয়ে দিতেও অনিহা নেই। আজকাল ক্লাব, মুভি এসবতো বলতে গেলে ছেড়েই দিয়েছে। ঠিক ঠিক আগের মত যেন আর প্রাণবন্ত চঞ্চল হয়ে ওঠে না—মাঝে মাঝে একটু উদাস হয়ে পরে--বোঝা যায় কোথায় যেন একটা নৈরাশ্য ওকে পীড়া দেয়। জিজ্ঞেস করায় কি জবাব দিয়েছিলো জানিস স্নুতপা—? —ঈর্ষা—দ্বেষ—হিংসা এসবই নীচতা, যতদিন তুমি আমি বাঁচি যেন মানুষের মত বেঁচে থাকি। —ঈর্ষা—হিংসা—ঘৃণা এসব নীচতার বিজ আমরা পৃথিবীতে বুনে দিয়ে যেতে চাই না—সোনিয়া—। অপরিছন্ন জীবন অস্বস্তিকর হয়ে পরতে পারে—তুমি আমাকে ভুল বুঝোনা সোনিয়া—। শান্তনুর চাহনি ছিল বেদনাহত—অপলক—স্থির ও ধীর। আমার মনে হচ্ছিলো আমি অপরাধী,—স্নুতপা। সান্তনা দেবার কোনো ভাষা ছিল না আমার—শুধু বলেছিলাম - শান্তনু, ছিঃ—অমন করে বলতে নেই। তুমি আর আমি, —তোমার আমার পৃথিবী—আমাদেরই, আমাদের দু'জনার,—আর কেউ নয় কারো নয়—যতদিন বাঁচার বাঁচবো—তারপর মরে যাবো, তুমি অমন করে ভেবো না শান্তনু—কষ্ট তোমার—আমারও। আমি আর কিছু বলতে পারিনি—সুতপা।

বুঝলো স্নুতপা—দ্বন্দ্ব যেখানে অপরিহার্য্য সুখ থাকলেও শান্তি সেখানে বিধ্বস্ত না হলেও বিব্রত। আচ্ছা সোনিয়া একটা কথা তোর কাছ থেকে জানতে চাইবো—তোর কি কখনও ছেলের কথা মনে পড়ে—?

—পরে—। জন্মাবার পরে আমার মনটা যেমন ঘৃণায় তিক্ততায় বিক্ষুব্ধ ছিলো এখন কিন্তু তেমন নেই সুতপা—। ওকে আনতে গিয়ে যখন আমি ওকে আমার বুকে চেপে রেখেছিলাম—সে এক অপরিসীম পরিতৃপ্তি—আপন রক্তের উষ্ণতা উপলব্ধি করা কত যে সুখকর—তোকে আমি কেমন করে বোঝাবো—সুতপা !

ভাবছে সুতপা—ঘটনার প্রতিক্রিয়া এড়ানো সত্যি বড় কঠিন। সোনিয়া সুখী—সোনিয়া শান্তিতে নেই। তাহলে সোনিয়া কি সত্যিই সুখী—? জানতে ইচ্ছে হলো সুতপার। সোনিয়ার হাতখানা ধরে নিলো—খানিকক্ষণ চুপ করেও থাকলো, বললো—ভবিতব্যকে তুই তো মেনেই নিয়েছিস সোনিয়া—।

চাপা কান্নায় ভেঙ্গে পড়লো সোনিয়া,—মথাটা নুইয়ে রাখলো ওদের দু'জনার ধরাধরি করা হাতের উপর,—আমি ওকে সারা জীবন ধরে ভালোবাসবো অথচ ওকে আমি ওর সন্তান উপহার দিতে পারবো না আমার নারী জীবন কত নিরর্থক - বলতো সুতপা—তুই-ই বল ! আবেগ রুদ্ধ কান্না ভেজা গলায় বলে যাচ্ছিলো সোনিয়া।

সোনিয়ার মাথায় বা হাতখানা বুলিয়ে বুলিয়ে সন্ত্বেনা দিচ্ছিলো সুতপা আর ভাবছিলো,—জীবন যন্ত্রনা—। অবশেষে একটা বড় নিশ্বাস ছেড়ে দিতে দিতে নিজের অজান্তেই মুখ থেকে বেরিয়ে এসেছিলো—দ্য ক্রুশিফিকেশন,—কাঁদিস্ না—সোনিয়া !